প্রথম প্রকাশ :—
আষাঢ় '৬১

প্রকাশক :—

নারায়ণ সেনগুপ্ত
সেনগুপ্ত এণ্ড কোং
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :—

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দত্ত
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট :—

ব্রজ রায় চৌধুরী

ব্লক :—

ষ্টাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :—

চয়নিকা প্রেস
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—১২

বাঁধাই :—

ইষ্ট এণ্ড ট্রেডার্স
২০, কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

॥ এক ॥

সহরের উত্তরপূর্বাঞ্চলে পোয়ার বাড়ী 'প্রিন্সেস্‌গার্ডেন।' রোজকার মত আজও বন্ধু লাওপেঙের সঙ্গে নৈশভোজনের জন্য পোয়া বেরিয়ে পড়ল। এই অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত জনবিরল। লোকজন প্রায় সকলেই বাড়ীঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে। এখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড জমি বা খোলা মাঠ। পাইপ টানতে টানতে ধীরমন্থর গতিতে পোয়া বন্ধুর বাড়ির দিকে চলছিল।

সাধারণত অক্টোবর মাসটা বেশ ঝরঝরে হয়। আজকের দিনটিও বেশ পরিষ্কার। সন্ধ্যার কড়া মিঠে বাতাসে সুন্দর একটা আমেজ আছে। শরতের রৌদ্রে ধূলিগুলি শুষ্ক ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। দ্রুত ঘনায়মান অন্ধকারে অস্পষ্ট সীমারেখা মিশে গিয়েছে। ঘরের দেওয়াল, টালিছাদ এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খালি জমিগুলি মিলে এক রম্য গোধূলি দৃশ্যের অবতারণা করেছে। রাস্তায় মাত্র কয়েকটি আলো, তাও জ্বালা হয়নি। চারিদিকে এক নিথর নিস্তব্ধতা, গা ছম ছম করে ওঠে। পাশের গাছটিতে গুটি কয়েক কাক কা-কা করে শুধু এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। একটু কান পেতে শুনলেই মনে হয় তন্দ্রালু নগরীর অস্পষ্ট ও ক্ষীণ এক ঐক্যতান ভেসে আসছে।

দু'একজন গরীব লোক হাতে পদ্মের পাতায় করে কিছু খাবার নিয়ে ঘরে ফিরছিল। কারও কারও হাতে তেলের পাত্র। প্রায় সিকি মাইল পথ অতিক্রম করবার মধ্যে পোয়া বিশেষ কাউকে দেখতে পেল না। কালো পোষাক পরা শ্রান্ত এক পুলিশ রাস্তায় এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। একমাত্র সেই পূর্বপরিচয়সূত্রে পোয়ার সঙ্গে দু' একটা

কথা বলল। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস, প্রদোষকাল, চতুর্দ্দিকে নাগরিক-জীবনের গাঢ় রহস্যময় স্তব্ধতা ; পোয়ার বেড়াতে ভালই লাগে।

নানসিয়াওকিয়েতে এসে সে যেন একটা প্রাণের স্পন্দন অনুভব করল। রাস্তার আলোগুলি এখানে জ্বালা হয়েছে। দুধারের গরীব গৃহস্থ বাড়ীর রান্নাঘরেব তেলের বাতিগুলি টিম টিম্ করছে। সরু উত্তর দক্ষিণ লম্বা অসমান এক গলি। এই গলির বাঁকের কাছে লাওপেঙের বাড়ী। অদূরে 'ইষ্ট ফোর পাইলোর' ; একটু দক্ষিণে বড় রাস্তার বাড়ীগুলি জাপানীরা দখল করেছে। গলিটিতে আলো নেই। দু'চারজন লোক অন্ধকারেই চলছে। রিক্সাওয়ালারাও অন্ধকারেই চলাফেরা করছে। তেলের বেজায় অভাব। ভাড়া না পেলে রিক্সাওয়ালারা গাড়ীর আলো জ্বালে না। লাওপেঙের বাড়ির সম্মুখের বাঁকটা বড্ড সরু। বাড়ীর দরজায় হুমড়ি খাবার উপক্রম হতে পোয়া বুঝলো যে সে এসে পৌছেচে।

বদ্ধ দরজার কড়া নাড়ার পর মনে হ'ল যেন লাওপেঙের পুরাণ চাকরটি কাশ্‌তে কাশ্‌তে এগিয়ে আসছে।

ভিতর থেকে সাড়া এল…'কে ?'

'আমি।'

'কে! আও সাওয়ে ?'

'হ্যা।'

ভীষণ কাশতে কাশ্‌তে লোকটি দরজা খুলে দিল।

পোয়া জিজ্ঞাসা করল, 'লাওয়ে বাড়ী আছে ?'

'না। সকালে বেরিয়ে গিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি। খাবার সময় ত হয়ে এল। মনে হয় শীগ্‌গীরিই আসবেন। ঠাণ্ডা পড়েছে—ভেতরে আসুন।'

পোয়া বৈঠকখানায় এসে উঠল। ঘরটা অদ্ভুত রকমের খালি,

আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। একটি বাজে কাঠের টেবিল, নীল কাপড়ে কুসানঢাকা খানকয়েক বেতের চেয়ার—বসলেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে একপাশে ঝুঁকে পড়ে, একটা দাঁত বের করা পুরাণ আর্মচেয়ার—টানগাঁ বাজারে পুরাণ কিনতে গেলে খুব জোর দশ ডলার দাম হবে। ঘরের উত্তরদিকের কোনটায় দেওয়ালে ঠেসদেওয়া গোটাকয়েক বাঁশের তাক—বই রাখবার, তাও আবার ভাঙ্গা; বই, পত্রিকা, গ্রামোফোন রেকর্ড গাঁদা করে তার ওপরে রাখা আছে। এই হ'চ্ছে ঘরের মোট আসবাব।

পোয়া আর্ম চেয়ারটায় বসল। নড়াচড়া করতে গেলেই লোহার স্প্রীঙের খোঁচা লাগে। আরাম করতে হলে কিন্তু লাওপেঙ এর ওপরেই হাত পা ছড়িয়ে বসে। টেবিলঢাকাটা সিগরেটের আগুনে কয়েক জায়গায় পুড়ে গিয়েছে। তাকের উপর কি বই যে আছে আর কি বই যে নেই তা বলা কঠিন। পশুপালন, মৌচাকের চাষ হতে আরম্ভ করে বৌদ্ধসংস্কৃতির বই—সবরকমই দু'একখানা আছে। 'স্নুরাগম' নামের একখানা বই পোয়া অনেকদিন আগেই এখানে দেখেছিল। তখন হতে পোয়া জানতে পারে যে লাওপেঙ 'চান বৌদ্ধ' সম্প্রদায়ের। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে দুইবন্ধুতে কোন দিন বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়ে আলোচনা করে নি। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রের মধ্যে লাল বার্ণিস করা গ্রামোফোনটাই কি রকম যেন খাপছাড়া বলে মনে হয়।

টেবিলে দুজনকে খাবার দেবার মত বন্দোবস্ত করা ছিল। এটা দৈনন্দিন ব্যাপার—তাই। দুই বন্ধুতে খেতে খেতে রাজনীতি, যুদ্ধের পরিস্থিতি, দেশের অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করে। একটা প্রবাদ আছে—দুঃখের সময় মদ খেতে খেতে কাঁদা ভাল। বহুদিন দুইবন্ধু নীরবে পানপাত্র নিঃশেষিত করেছে, আর অবিরাম অশ্রু বর্ষণ করেছে। চীনে এই রীতিটিকে বলে 'চো-ইন' অর্থাৎ শোকাশ্রুপান

—আর বন্ধুদ্বয় এর নামকরণ করেছিল 'টুই' অর্থাৎ শোকের মুখোমুখি বসে মদ্যপান। আজকাল এই নিত্যনৈমিত্তিক রীতি প্রায় উঠে গিয়েছে —কিন্তু পোয়া ও লাওপেঙ এটাকে এখনও বজায় রেখে চলেছে।

বৃদ্ধ চাকরটি এক কাপ গরম চা দিয়ে গেল।

পোয়া খবরের কাগজটা পড়বে বলে তুলে নিল। কিন্তু নানা জটিল বিষয় ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কখন যে কাগজখানা হাত থেকে পড়ে গিয়েছে তার খেয়াল নেই। কয়েক বছর আগে লাওপেঙের সঙ্গে তার পরিচয়। প্রথম আলাপেই পোয়া আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এরকম নির্ভীক, নির্বিকার সুখী লোক পোয়া আর দেখে নি। অথচ এই রকম সামান্য অবস্থায়, এই ধরণের ঘরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি বাস করে তা কে জানে। পিপিঙের মত সহরে লাওপেঙকে কেই বা চেনে। জীবনে নাম কেনবার মত কিছুই সে করে নি। আজীবন অদ্ভুত খেয়ালের বশবর্তী হয়েই চলেছে। পিপিঙে টম্যাটো হয় না—লাওপেঙের খেয়াল হল এদেশে টম্যাটোর চাষ করবে। বেশ কিছু লোকসান দিয়ে তবে সে ও চেষ্টা ছাড়ল। তারপর ঠিক করল মুরগীর চাষ করবে। মুরগীকে কডলিভার তেল খাওয়ালে ডিম বড় হবে এই ভেবে সে চেষ্টাতেও বেশ কিছু অর্থব্যয় করল। শেষে দেখল এত খরচ করে বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় না। তখন মৌচাকের চাষ করতে আরম্ভ করল। টাকা পয়সা নষ্ট হল, লাভ কিছুই হ'ল না। শেষে মাথায় সুবুদ্ধির উদয় হল এবং বাকী টাকা পয়সা যা ছিল একটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে শান্তিতে ও নিরুদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিল।

দশ বছর আগে লাওপেঙের স্ত্রী মারা যায়। তখন লাওপেঙের বয়স মাত্র চৌত্রিশ। দাম্পত্য জীবনেও তার খেয়ালের অন্ত ছিল না। স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য তার কি অফুরন্ত চেষ্টা। কিন্তু

কিছুতেই কিছু হয় না। তার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে বলে 'আমার মাথাটা আর খারাপ করে দিয়ো না—লেখাপড়া শেখা আমার দ্বারা হবে না।'

'না, তোমায় শিখতেই হবে।'

'তুমি আমায় রেহাই দাও দিকিনি। ধরো এটাও তোমার একটা ব্যর্থতা। তোমার টম্যাটোর চাষে বা মুরগীর চাষে আমি কোন দিন বাধা দিই নি। কাজেই আমার এই ইচ্ছাতেও তুমি বাধা দিও না।'

বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে লেখাপড়ার হাত থেকে রেহাই দিতে হ'ল। তবুও ঐ সব দিনের কথা লাওপেঙের মনে সুখ-স্মৃতির মত বিরাজ করছে। স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাবার ব্যর্থচেষ্টার সময়টা তার বেশ ভাল ভাবেই কেটেছিল, সে সময়টা সত্যিই সে ভালভাবে উপভোগ করেছিল। স্ত্রীর স্মৃতি তার মনকে আজও ভরপুর রেখেছে, তাই সে পরে আর বিয়ে করে নি। এই ব্যর্থতার পর লাওপেঙ উঠে পড়ে লাগল বর্ণমালাকে আরও সহজ করতে, যাতে সাধারণে সহজে শিখতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এবারেও সে সফলকাম হ'ল না।

এইভাবে সকল প্রচেষ্টায় বিফল মনোরথ হয়ে বন্ধু পেঙ পিকিংএ অজ্ঞাতই রয়ে গেল। তবে রাজনীতিক মহলে তার দু' একজন বন্ধু-বান্ধব ছিল। জেনারেল পাই ও ওয়াংপো একাডেমির দু' একজন গ্র্যাজুয়েটের সঙ্গে তার কিছুটা ঘনিষ্ঠতাও ছিল।

লাওপেঙের ফিরতে দেরী হচ্ছিল। তার সঙ্গে পোয়ার অনেক কথাবার্তা ছিল। আলাপ আলোচনা করবার মত বা প্রাণখুলে কথাবার্তা বলবার মত বন্ধু এ সহরে একমাত্র লাওপেঙ। পিকিং জাপানীরা দখল করবার পর পোয়ার আত্মীয় স্বজন সকলে দক্ষিণাঞ্চলে চলে যায়। তখন হতে পোয়া বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তাই সারাদিন বাগান বাড়ীতেই থাকে—সন্ধ্যে বেলায় পেঙের কাছে আসে, আলাপ

আলোচনা করে, বহু সমস্যার একটা স্থির সমাধান এই বন্ধুর কাছে পায়। নিঃসঙ্গ জীবনই তাকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে লাওপেঙের সঙ্গে। অথচ উভয়ের আর্থিক অবস্থার পার্থক্য অনেক। পোয়া ধনী ও বিলাসী, অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী তার বান্ধবী।

পোয়া ভাবছে মালিনের সঙ্গে বিকেলের আলাপের কথা। তন্বী, সুন্দরী তরুণী এই মালিন। পোয়ার মনে হচ্ছিল সে বোধ হয় মলিনকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। লাওপেঙ জানতে পারলে কি ভাবে নেবে?

পোয়া ধনী। আড়ম্বর বিলাসিতার মধ্যে সে মানুষ। কাব্য, সাহিত্য ও নারীতে তার এক বিশেষ আকর্ষণ আছে। তার চালচলন আদবকায়দা বড়লোকী ধরণের, আভিজাত্য মাখা বলা যায়। অন্য দিকে লাওপেঙ গরীব। পোয়ার সামাজিক জীবনের সঙ্গে লাওপেঙের কোন মিল নেই। নারী সম্বন্ধে তার বিশেষ কোন আগ্রহ নেই। আপন ভোলা মানুষ, বয়স পঁয়তাল্লিশ, সম্পূর্ণ সন্ন্যাসীর মত তার জীবনযাত্রা প্রণালী। অত্যন্ত উদার। একবার পাড়াপড়সীদের মধ্যে জনকয়েককে নিয়ে এক স্কুল খোলে। বিনে পয়সায় তাদের পড়াবে। কিন্তু এবারেও তার চেষ্টা বিফল হয়। একে একে সব ছাত্রই পালাল। একটি মাত্র গোমূর্খ ছাত্র শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকে। তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য লাওপোঙের কি চেষ্টা। পোয়া দেখে শুনে একদিন বলল, 'আচ্ছা ঐ হস্তীমূর্খ ছেলেটার পেছনে অত খেটে কি হবে? পেঙ উত্তরে বললে, 'ছেলেটি প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি বলেছে লেখাপড়া না শিখলে তাকে বিয়ে করবে না। কাজেই লেখাপড়া শেখার ওপর তার জীবনের সব কিছু নির্ভর করছে। আমি একদিন তাকে বলেছিলাম—এ তোমার দ্বারা হবে না, ছেড়ে দাও। ছেলেটি কেঁদে ফেললে। বললে, স্কুলে মাইনে দিয়ে শেখবার সামর্থ্য তার নেই, অথচ লেখাপড়া না শিখলে

মেয়েটি তাকে বিয়ে করবে না। জানই তো, প্রেমে পড়ে কত লোক আত্মহত্যা করে। একবার ভেবেই দেখ না। বড়লোকেরা একটি মেয়ের পিছনে কত হাজার হাজার টাকা ওড়ায়। কাজেই ছেলেটির এই নির্দ্দোষ চেষ্টায় দোষ কি? তাছাড়া এই বিয়ের ওপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মেয়েটির কিছু টাকাপয়সা আছে। বিয়ের পর ছেলেটিই তো তার মালিক হবে। কাজেই আমার চেষ্টায় যদি বিয়েটা হয় ক্ষতি কি?'

অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে হয়েছিল। লাওপেঙ অত্যন্ত খুসী হয়েছিল, ভেবেছিল এর চেয়ে বড় পারিশ্রমিক তার আর কিছুতেই হতে পারে না।

রাত তখন আটটা, লাওপেঙ ঘরে ফিরল।

'খুবই দেরী করে ফেললাম, সত্যিই খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে' মিহি অথচ বেশ উচু গলায় লাওপেঙ বললে।

বেশ লম্বা চওড়া লোক এই লাওপেঙ। চৌকো মাংসল শান্ত মুখ। ঠোঁটের কোনে যেন হাসি লেগেই আছে। চোখে মুখে একনিষ্ঠতা ও সহৃদয়তার ছাপ সুস্পষ্ট। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গোঁপ কোনদিনই কামায় না। চুলগুলি লম্বা লম্বা—পেছনের দিকে দেওয়া, তাতে কোন কালেই চিরুণী পড়ে না। অত্যধিক ধূমপানের জন্য অসমান দাঁতগুলিতে কাল ছোপ ধরে গিয়েছে। পোষাক পরিচ্ছদের দিকে একেবারেই কোন লক্ষ্য নেই; জুতোর একপাটিতে ফিতে আছে, আর এক পাটিতে হয়ত নেই। গলার স্বর মেয়েমানুষের মত সরু।

বৃদ্ধ চাকরটি এক গামলা গরম জল এনে এককোনে রেখে খাবারের ব্যবস্থা করতে গেল। পেঙ হাত মুখ ধুতে লাগল।

পোয়া জিজ্ঞাসা করল 'তোমার কাজ হাসিল হয়েছে।'

তোয়ালে নিঙড়োতে নিঙড়োতে পেঙ উত্তর দিল 'হ্যাঁ! এখন আমায় দু'হাজার ডলার দাও।'

'কি জন্মে ?'

'ভদ্রমহিলা অস্ত্রশস্ত্র কিনবেন, পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে পাঠাতে হবে।...তিনি বলছিলেন যে উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশে বহু ছাত্র ও অধ্যাপক এ কাজে যোগ দিতে চায় ; কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের বড় অভাব।'

চাকরটি খেতে দিয়ে মদ ঢালছিল।

পোয়া জিজ্ঞাসু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লাওপেঙের দিকে তাকাল। পেঙ বলল, এর চেয়ে বিশ্বাসী লোক আর কোথাও পাবে না—সুতরাং বিনা দ্বিধায় আলোচনা করতে পার।' লাওপেঙ বলে চলল, 'তুমি জান এই সব মারামারি, কাটাকাটি ও নরহত্যাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। কিন্তু তুমি যদি আমার মত একবার দেশের অবস্থাটা ঘুরে দেখতে, তাহলে দেখতে পেতে সেখানে কি হচ্ছে। কত বাড়ীঘর ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, কি রকম অগণিত নরহত্যা সেখানে হয়েছে। আমাদের দেশবাসী অসহায় ভাবে শত্রুর হাতে মরেছে। তাদের অন্ততঃ আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। এ যুদ্ধে দু'দল সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ নয়—এ হচ্ছে নিছক একতরফা দস্যুতা ও হত্যার তাণ্ডবলীলা। আমাদের জনসাধারণের অসহায় ভাবে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গ্রামের পর গ্রাম শত্রুদের হাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।'

মুহূর্ত্তের জন্য তারা নীরবে মদের পেয়ালায় চুমুক দিল। পেঙ আবার বলতে লাগল—'এ সব দেখলে তোমার মনের অবস্থা কি হতে পারে, একবার ভেবে দেখ। রাস্তার দুইপাশে মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। ছোট ছোট ছেলের মৃতদেহ, চাষী রমণীর মৃতদেহ, কোনটা মুখ থুবড়ে, কোনটা বা চিত হয়ে, কোনটা বিকলাঙ্গ হয়ে—কোনটা বা বিকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বলতে পার কি অপরাধে এরা মৃত্যু বরণ করলে! কি কারণে আজ আবালবৃদ্ধবনিতা ধনী দরিদ্র সকলে গৃহহীন, বস্ত্রহীন, অন্নহীন!'

'তাদের জন্যে তুমি কি করতে চাও?'

'আমার ক্ষমতা খুবই কম। আমি কেন, যে কোন একজনের পক্ষে তাদের জন্যে কিছু করা প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। এই যে অগণিত লোক আশ্রয়হীন অবস্থায় এদিকে আসছে, তারা কি ভাবে বাঁচবে। একা কারও পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, অথচ তাদের সবাইকে বাঁচাতে হবে।···আমি টাকা সংগ্রহ করে সেই অধ্যুষিত অঞ্চলে যেতে চাই। তোমার পক্ষে বাঁধনহীন ভাবে সব জায়গার যাওয়া সম্ভব নয়। আমার কোন বাঁধন নেই—কাজেই আমি এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই।

পোয়া অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে কোনদিন যুদ্ধকে দেখে নি। এতদিন সে যুদ্ধকে বিশ্লেষণই করে এসেছে! বিশ্লেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সে যুদ্ধনীতি, কৌশল ও যুদ্ধপরিচালনার কথাই চিন্তা করেছে। কি ভাবে চীন যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তাই ছিল তার চিন্তা। তার মত ছিল যুদ্ধ যদি বেশীদিন স্থায়ী হয়, তা হলে জাপান হারতে বাধ্য। যুদ্ধে জনসাধারণ কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা সে কোন দিনই চিন্তা করে নি। এই দুঃস্থ দেশবাসীকে নিজের ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, বাবা মা বা পরিবার বলে ভাবে নি। তাই, লাওপেঙের কথায় যুদ্ধের আর একটা দিক তার চোখে ভেসে উঠল। এই অগণিত জনসাধারণের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ঘৃণা-ভালবাসা, আশা দুরাশা, বিরহ-মিলন, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ত্যাগ, জীবন-মরণ, সবকিছুই তার দৃষ্টিতে এক বিরাট রঙ্গমঞ্চের অভিনয় বলে মনে হতে লাগল। মনে হল, যেন তার এতদিনকার চিন্তাধারা, যুদ্ধের মানচিত্র, সৈন্যসামন্ত, যুদ্ধনীতি, রণকৌশল, দেশপ্রেম এবং বিদ্যাবুদ্ধির সবকিছু দান তাকে এই রূঢ় সত্য হতে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সারাজীবনের অধ্যয়ন, জ্ঞান, বিদ্যা দিয়ে সে যা দেখতে পায় নি, অনুভব করতে পারে নি—লাওপেঙ হৃদয় দিয়ে তা অনুভব

করেছে। আসল সত্যকে উপলব্ধি করেছে। মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্যে তার মধ্যে কি রকমের একটা ব্যাকুলতা এল।

'তুমি কোথাও যাচ্ছ? কি ভাবে কি করতে চাও সব খুলে বল।'

'যে অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে সেখানে যাব। সেখানে গেলেই সবচেয়ে বেশী কাজ করতে পারব।'

'কোন সংগঠন বা দল, কোন কার্য্যসূচি তোমার নেই?'

'না আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। বসে বসে জল্পনা-কল্পনা করবার মত কোন সংগঠন আমার নেই। বিপদের মধ্যে বাস না করলে, সেখানে না থাকলে, এখানে বসে কি করে স্থির করা যায় কোথায় সাহায্যের বেশী দরকার। কাজেই কোন দলের বা সংগঠনের নির্দ্দেশের প্রয়োজন আমার নেই।'

'তাতে সমগ্র দেশের কতখানি উপকার করতে পারবে?'

'তা জানি না তবে যদি একটি জীবনও রক্ষা করতে পারি তা হলে বুঝব অনেকখানি করতে পেরেছি।'

'সমগ্র দেশের প্রশ্ন যখন সুমুখে তখন একটা জীবনের মূল্য কতখানি?'

'অনেক খানি।'

তাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। দুজনই নীরবে বসে পাইপ টানতে লাগল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে লাওপেঙ আবার বলতে আরম্ভ করল, 'এই মিসেস চাও এক অদ্ভুত ধরণের মহিলা। বয়েস পঞ্চাশ ষাট হবে। লেখাপড়া জানেন না, একেবারে অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত নেই। তিনি এই সহরেই আত্মগোপন করে আছেন। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি সাহায্যের আবেদন না করে, সোজাসুজি দাবী করলেন যে এই আমাদের দরকার। সে দাবী কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।'

'তুমি তাঁকে কত দেবে বলেছ?'

'দু'হাজার ডলার।...সম্পূর্ণ তোমার ভরসায়।'

'ঠিক আছে।'…অস্ত্রশস্ত্র তিনি কোথা থেকে কিনবেন?

'দক্ষিণ অঞ্চল থেকে। উনত্রিংশ বাহিনী পিছু হটে আসবার সময় বহু অস্ত্রশস্ত্র ফেলে আসে। সেখানকার সাক্ষীগোপাল পুলিশবাহিনী সেগুলি হস্তগত করে রাখে। একটু ঘোরাপথে টাকা ঢাললেই পাওয়া যায়। পার্বত্য অঞ্চলে তাঁর যে দল আছে, এগুলি সংগ্রহ করে তিনি তাদেরকে দেবেন।'

'তাঁকে দেখতে কি রকম?'

'অতি নম্র, ধীরপদক্ষেপে চলেন। দেখলেই তাঁকে ঠাকুরমা বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়। মাঞ্চুরিয়া থেকে এসেছেন। ১৯৩২ সাল হতে তিনি এই কাজে নেমেছেন। সোহসিয়েনে জাপানীদের যে অত্যাচার হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, ধর্ষণ আমি দেখেছিলাম তা যখন তাঁকে বললাম তখন তিনি বললেন—ওসব পুরোণো ব্যাপার। খাস চীনে এসব নূতন হলেও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জাপানীদের এ অত্যাচার অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন—দস্যুদের চেয়ে অনেক ঘৃণ্য অনেক নীচ এই জাপানীরা। আগে এদের নাম শুনলেই আমি আঁতকে উঠতাম। যখন তাদের অত্যাচার, নৃশংসতা, নারী ধর্ষণ, শিশু ও নারীহত্যা, আমার চোখের সামনে হতে লাগল তখন আমার ভয় কেটে গেল—পরিবর্তে চরম ঘৃণা আমার মনে স্থান পেল। এই যুদ্ধে ভগবান আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার সুযোগ দিয়েছেন। এ কথা সকলেই জানে যে বিজিত জাতি যদি বিজেতার উপর ঘৃণা পোষণ করে, তা হলে সে জাতিকে জয় করা যায় না।'

'আমার যুদ্ধনীতির সঙ্গে এ কথা বেশ বুঝা যায়। আমরা যদি আমাদের strategy বা রণনীতি ঠিকমত মেনে চলি, তা হলে নিশ্চয়ই জয়লাভ করব।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পোয়া বলল।

তোমার strategy বা রণনীতিটি কি রকম?

পোয়া বলতে লাগল। 'সর্বপ্রথম আমাদের এই যুদ্ধের স্বরূপটি বুঝতে হবে। সাধারণতঃ দুই দেশের মধ্যে বা দুই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যে যুদ্ধ—এ তা নয়। এ হচ্চে সমগ্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। জাপানীরা সাংহাই দখল করতে চলেছে, তারপর তারা নান্‌কিংএর দিকে এগুবে এবং পরে চেষ্টা করবে সমুদ্রোপকূল অবরোধ করতে। ইতিমধ্যে যদি আমাদের দেশের লোকের মনোবল ভেঙ্গে যায় তা হলে সব গেল,—আর তা না হলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাবে। সমগ্র সমুদ্রোপকূল ছেড়ে দিতে হবে। সেখানকার অধিবাসীদের চলে আসতে হবে, না হয়ত দাসত্ব বরণ করতে হবে। তারপর যুদ্ধের দায়িত্ব পড়বে সাধারণ লোকের ওপর। কিন্তু এই দায়িত্ব বহন করতে হলে জনগণের নৈতিক বলের প্রয়োজন। আর এই নৈতিক বল অটুট রাখতে হলে জাপানীদের ঘৃণা করতে হবে। দেশবাসীদের মনে ঘৃণার সঞ্চার করবে জাপানীদের নৃশংস ও পাশবিক অত্যাচার। জাপানীরা এই অত্যাচার যত পুরোমাত্রায় চালাবে, ততই আমাদের জয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তাদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে লোকে ঘরবাড়ী আত্মীয় স্বজন, সহর গ্রাম পরিত্যাগ করে পালাতে থাকবে। কোন লোকই স্বেচ্ছায় বাড়ীঘর, যথাসর্ব্বস্ব ছেড়ে সহজে পালায় না। এই নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচার চললেই যে হ'ল তা নয়, কারণ সব যুদ্ধেই তো এগুলি হয়ে থাকে। এর পর জনসাধারণকে তারা ক্রীতদাসে পরিণত করবে। তাদের পক্ষে যারা যোগ দেবে তাদের ওপরেও এই অত্যাচার সমান ভাবে চালিয়ে যাবে। স্বপক্ষ বিপক্ষ কেউ কোন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাবে না। এই অত্যাচারের কাছে মা, ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, চাষী-মজুর, ব্যবসায়ী, চাকুরিয়া, ধনী, দরিদ্র কারও কোন বিভেদ থাকবে না। এতদূর হলেও বলা যায় না যে সকলে বাড়ীঘর ছেড়ে সব পুড়িয়ে বা নষ্ট করে দিয়ে চলে আসবে।

প্রত্যেকটি লোক যখন এই পাশবিকতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করবে—এত বেশী অত্যাচারিত হবে যে গৃহহীন, আশ্রয়হীন, স্বজন বান্ধবহীন অবস্থায় অনাহার অনিদ্রার মধ্যে সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক কৃচ্ছসাধন করে পলাতক হওয়াই শ্রেয় বলে মনে করবে, তখনই তারা পোড়ামাটী নীতি অবলম্বন করে পালিয়ে আসবে। এই যথেষ্ট নয়, কারণ এতে পলায়নের মনোবৃত্তি আসতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহের মনোভাব আনতে হলে আরও বেশী দরকার। যেমন ধরো স্বামীর কাছথেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেওয়া, তারই সম্মুখে তাকে ধর্ষণ করা, বাপের চোখের ওপরে মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা, তার শ্লীলতাহানি করা ইত্যাদি। ছোট ছেলেদের ওপর বেয়নেট শিক্ষা করা, যুদ্ধবন্দীদের জীয়ন্ত পুড়িয়ে মারা বা কবর দেওয়া, তাদের একজনাকে দিয়ে অন্তজনকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা, প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বসমক্ষে যৌন সঙ্গম করা, এই রকম আরও বহুবিধ অত্যাচার।' পোয়া নির্বিকার চিত্তে বলে চললো 'এগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত শোনাচ্ছে। কিন্তু এ সবই হচ্ছে ও হবে। গরীব বা চাষীদের মেয়ে বউকে তারা যেমন টেনে নিয়ে যাবে, ধনীদের মেয়ে বউএর ওপরেও তারা তেমনি ভাবে বলাৎকার করবে। বড় বড় কারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করবে। গ্রাম নগর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। এইসব যখন তারা করবে, তখনই তাদের সামরিক উদ্দেশ্য বিফল হবে; আমাদের জয়ের পথ উন্মুক্ত হবে।'

পোয়া থামল। পাইপটা নিভে গিয়েছিল, সেটা আবার ধরালে। লাওপেঙ্ দেখছিল তার বন্ধু কি রকম নির্বিকারভাবে এসব কথাগুলি বলে চলছিল। লাওপেঙ্ বলল, 'পোয়া তুমি নিজেই জান না কি বলছো! মানুষের দুঃখ দুর্দশার ওপর কোন গুরুত্বই তুমি আরোপ করছ না। তুমি এমন ভাবে বলে চলেছ, মনে হয় যেন তুমি চাও

আমাদের দেশবাসীর ওপর আরো অত্যাচার হোক্—তারা ঐ রকম দুর্দ্দশার মধ্যে পড়ুক।'

'না, আমি তা চাই না। যা হচ্ছে বা হবে তাই বলছি মাত্র। যুদ্ধের স্বরূপ ও চরিত্র বিশ্লেষণ করছি মাত্র। জাপানীদের সম্যক্ পরিচয় ও স্বরূপ এতদিন জানতে পারি নি বলেই আমি নিশ্চিত হতে পারি নি আমরা জিতব, না তারা জিতবে। এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। যুদ্ধের পর আমি একবার জাপানে যাব তাদের সম্বন্ধে জানবার জন্যে।'

লাওপেঙ্ বলল, 'কিন্তু আমি ভাবছি কি জান?—চীন ও জাপান এই দুই জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তা কতদিন থাকবে! ভেবে দেখ আমাদের দেশবাসী যা স্বচক্ষে দেখল তা পঞ্চাশ বছরেও ভুলতে পারবে না। সমগ্র চীন তার প্রতিবেশী সম্বন্ধে এত নীচ ধারণা পোষণ করবে। মনে রেখো, সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত ঘৃণা চলে যেতে পারে; কিন্তু বিদ্বেষ সহজে চীনবাসীর মন থেকে মুছে যাবে না। একবার যদি তুমি শত্রুর ওপর শ্রদ্ধা হারাও তা হলে চিরতরে সে শ্রদ্ধা হারালে। মিসেস্ চাও ঠিকই বলেছেন—বিজিত জাতি যদি বিজেতার ওপর শ্রদ্ধা হারাতে আরম্ভ করে—তা হলে সে জাতিকে জয় করা যায় না।'

পোয়া—'জাপানীদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত এবং আসলে তারা এই কারণেই নিজেদের সম্মান সম্বন্ধে এতবেশী সচেতন। এই কারণেই তারা জোর করে আমাদের কাছ থেকে সেলাম আদায় করে, যাতে করে আত্মসম্মানটা যদি ফিরে পাওয়া যায়।'

লাওপেঙ্—'ওকথা থাক্, তোমার strategyর কথা বল।'

পোয়া—'হ্যাঁ—এতক্ষণ অর্দ্ধেকটা বললাম, আর এই অর্দ্ধেক সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত; অর্থাৎ বাকীটা সম্বন্ধে নই। ধরো জাপানীরা

সমুদ্রোপকূল, দখল করে নিল এবং আমাদের লোকেরা ঘরবাড়ী ছেড়ে পোড়ামাটী নীতি অবলম্বন করে চলে এল, আমাদের নৈতিক বলও অটুট থাকল, দেশবাসী ও আমাদের সৈন্যরা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হ'ল, তাদের জাপানী ভীতি কেটে গেল, তবুও আমরা জয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আরও অনেক কিছুর ওপর জয় নির্ভর করছে। জাপানীরা উপকূল দখল করে সমস্ত দেশ গ্রাস করবার জন্য অগ্রসর হতে থাকবে, আর তখন আমাদের হাতে আছে সারাদেশ পিছু হটবার জন্যে। তখন খানিকটা অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে বেশী সময় হাতে পাবার জন্যে খণ্ডযুদ্ধ করতে হবে। প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধাগুলিকে পুরোমাত্রায় গ্রহণ করতে হবে এবং দেশের জনসংখ্যার সদ্ব্যবহার করতে হবে। উপকূল, ইয়াংসী নদী এবং নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করা জাপানীদের পক্ষে সহজ, কিন্তু বাকী সবই পার্বত্য অঞ্চল এটা আমাদের ভুললে চলবে না। শত্রুপক্ষের যত বেশী ক্ষতি করা যায় তার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। তাদের অগ্রগতি ব্যাহত করতে হবে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সুশিক্ষিত ও সুসংহত করতে হবে। আর চেষ্টা করতে হবে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে। দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, যুদ্ধোপকরণ সৈন্য সরবরাহ, যানবাহন, রেল লাইন, রাস্তা, নদীনালা, জনস্বাস্থ্য, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সামরিক শিক্ষা শিবির, আশ্রয়প্রার্থীর খাওয়া থাকা ইত্যাদি সব বিষয়ে নজর রাখতে হবে, উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। এর সঙ্গে গ'ড়ে তুলতে হবে গেরিলা বাহিনী। গেরিলা বাহিনী ছাড়া শত্রুদের উদ্ব্যস্ত বা ক্ষতি সাধন করা সম্ভব হবে না। গেরিলা বাহিনী যত তৎপর হবে শত্রুসৈন্যের মনোবল বা নৈতিক বল তত দুর্বল হবে। উপরন্তু কড়া নজর রাখতে হবে যাতে বিভীষণ পন্থী পঞ্চমবাহিনীর সৃষ্টি না হয় আমাদের মধ্যে। এইসব কিছুর ওপর নির্ভর করছে আমাদের জয়।'

'পোয়া, তুমি আমার সঙ্গে চল। দুজনে মিলে অনেক কিছু করতে পারব। এখানকার এই পারিপার্শ্বকের মধ্যে বাস করতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া তুমি কখনও দেশের অভ্যন্তরে যাও নি। তুমি রণনীতি বিশারদ; কিন্তু তোমার এই strategy বা tactics এখন কোন কাজেই লাগবে না, দেশের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম। বরঞ্চ নানা জায়গা ঘুরে, নানা লোকের সঙ্গে মিশে ও তাদের জন্য নানারকম কাজ করে তোমার মানসিক অবস্থা ভালই হবে।'

'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম।'

'জানি তোমার পক্ষে এ কাজে নামা কঠিন, তোমার জীবনযাত্রা প্রণালী অন্যধরণের। তাছাড়া তোমার স্ত্রী...'

'না, সে জন্যে আমার কোন চিন্তাই নেই।'

'তোমার বউকেও এ পথে আনতে পার। সে কলেজে পড়া শিক্ষিত মেয়ে, গ্রাজুয়েট, বেশ শক্তসমর্থ। আমাদের ঐ রকম একটা মেয়ের প্রয়োজন আছে।'

'তুমি ভুল করছ। আমি তোমারই মত নিশ্চিন্ত আর অনায়াসে বাড়ীঘর ছেড়ে বেরিয়েও পড়তে পারি; কিন্তু আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের মেয়ে—তার জগৎটাই আলাদা। এসব কথা তার সঙ্গে আলোচনা পর্য্যন্ত আমি করতে পাই না। সেই কথাই আমি ভাবছিলাম।'

'ব্যাপারটা কি?'

'দেখ, বিয়েটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কলেজে পড়বার সময় আমার বউ ভাল খেলতে পারত, দেখতেও বেশ ভাল ছিল, দেহখানিও তার লোভনীয় ছিল। বিয়ের আগে আমি যে রকম বউ চেয়েছিলাম—তাই-ই পেয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। সেজন্য হয়ত আমিই দায়ী। তার ওপর অবিচার আমি

করেছি। তুমি তো জান যে স্বামী হিসেবে আমি আদর্শ স্থানীয় নই। আমার বউও সে কথা জানে। তবে মালিনের কথা ভাবছি।'

'মালিন কে?'

'আমার খুড়ীমা লোলার বন্ধু। আমাদের সঙ্গে গত তিন সপ্তাহ যাবৎ আছে। সে সাংহাই যেতে চায়, কিন্তু সঙ্গী পাচ্ছে না। কাজে কাজেই আমাদের কাছে আছে; বরঞ্চ বলতে পার আমার কাছেই আছে। অন্ততঃ আমার স্ত্রী সেই রকমই ভাবে।'

'ওঃ বুঝেছি, যাকে বলে বয়েসের ধর্ম্ম।'

'আমার মনে হয় এই ক'দিনেই আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। আমি আর নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না—আমার কাছে সে যেন একটী হেঁয়ালী। এক এক সময় তাকে মনে হয় ছেলেমানুষ—আবার এক এক সময় তাকে এত গম্ভীর দেখি…। তার চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় সেখানে যেন এক বিষণ্ণতার ছাপ, আবার তার মুখের দিকে তাকালেই সব গোলমাল হয়ে যায়,—কি এক চপল দুষ্টুমি মাখা হাসি ঠোঁটের কোণে। তার বিষাদ মাখা চাউনি, তার ঠোঁটের কোণের চপল দুষ্ট হাসি…সবই আমার ভাল লাগে। তার সান্নিধ্যটুকু, তার উপস্থিতিটুকু পর্য্যন্ত আমায় উৎফুল্ল করে তোলে। প্রেমে পড়ার লক্ষণ যদি এই হয়, তা হলে আমি তার প্রেমে পড়েছি।'

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে লাওপেঙ বন্ধুর দিকে চেয়েছিল।—'তুমি তাকে সাংহাই নিয়ে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ, কতকটা সেই রকমই স্থির করেছি। আমার বউ সাংহাই-এ তার বাপের বাড়ী যেতে চায়। আমাকে নিয়ে যেতে বলেছে; মালিনও সঙ্গে যাবে।…তুমি হাসছো! বউকে বাপের বাড়ী রেখে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারব।'

'তাকে ত্যাগ করছো না তো ?'

'হয়ত বা করছি। হয়ত না, দোষ আমারই। একদিন আমরা সুখীই ছিলাম, কিন্তু এখন আর নয়। বছর খানেক আগে তার সঙ্গে একবার দুর্ব্যবহার করেছিলাম, সেই থেকে সে আমার ওপর বিরূপ। এখন সে ঐশ্বর্য আর অভিজাত সম্প্রদায় নিয়ে ব্যস্ত। আমায় ক্ষমা করতে পারে নি।'

'বলতে চাও যে অন্যায় তার তরফেরই।'

'তুমি জান না সে তার অভিজাত সম্প্রদায় আর ঐশ্বর্য নিয়ে কি রকম সুখে আছে। অদ্ভুত তাদের কথাবার্তা, অদ্ভুত তাদের আচার-ব্যবহার, অদ্ভুত তাদের আদব-কায়দা। আর আমার বউ! ...তুমি তো আর আধুনিক গ্রাজুয়েট মেয়ে বিয়ে কর নি, কি করে বুঝবে। বিয়ে কিসের জন্যে বলতে পার? ...আদান-প্রদানের সম্পর্ক মাত্র! বিয়ে করার একটা উদ্দেশ্য আছে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকলের কাছে তার একটা কর্তব্য আছে, তার কিছু দেয় আছে। তা না হলে বিয়ের কিছু প্রয়োজন ছিল না, রক্ষিতা রাখলেই চলতো। একজন রক্ষিতা তোমাকে আনন্দ দান করবার জন্যে যথাসাধ্য করে, পরিবর্তে তুমিও তাকে কিছু দাও। কিন্তু রক্ষিতা বিবাহিতা স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে না, কারণ সমাজে স্ত্রীর সম্মান তাকে দেওয়া হয় না। তোমার দেহ, মন, ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ, দুঃখ সব কিছুর ওপরেই তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে। তার তুলনায় রক্ষিতার স্থান কোথায়? সমাজ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। স্ত্রীর স্থান কত নিরাপদ, কত দৃঢ়। নিজের সম্বন্ধে কত বেশী সে নিশ্চিন্ত। বোধ হয় গলদ এইখানেই।'

'হয়ত তোমার কথা সত্যি। কিন্তু তাই বলে একটা নির্বোধ মেয়ের ওপর অবিচার করো না। দরিদ্র অবস্থা থেকে এসে তোমার ঐশ্বর্যের মধ্যে পড়ে যদি সে দিশেহারা হয়ে থাকে, তার জন্যে তাকে দোষ দিও না।'

'হ্যাঁ, বড়লোকের ঘরে যেন কোন দরিদ্রের মেয়ে না আসে। সে দিশেহারা হয়ে পড়বেই।'

'দেখ, আমি বুঝছি না এক্ষেত্রে কি মন্তব্য আমার করবার আছে। তোমার স্ত্রী একটি রত্নও হতে পারে বা একেবারে অপদার্থও হতে পারে। একবার মাত্র আমি তাকে দেখেছি। তার কথা বাদ দাও। মালিন সম্বন্ধে তোমার ব্যক্তব্য কি? আর তার সম্বন্ধে তুমি করছোই বা কি?'

'মালিন···আমি কিছুই, স্থির করতে পারছি না।'

'তোমার সমস্যাটা কি?'

'সে লোলার বন্ধু এবং তারই অনুরোধে আমাদের সঙ্গে বাস করছে। তার নিজের ব্যক্তিগত বিষয় সে কিছুই বলবে না। লোলা হয়ত আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চায়। অবশ্য এটা আমার কল্পনাও হতে পারে। তুমি তো লোলাকে চেন।'

'তুমি বলতে চাও যে লোলা তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত করছে!'

'লোলা যদি করেও তাতেও আমি বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হব না।'

'এ রকম একটা মেয়েকে অনুক্ষণ সঙ্গে নিয়ে তোমার রাজনীতি সংক্রান্ত কাজকর্ম কতদূর চালাতে পারবে মনে কর?'

'মেয়েটির ওপরই সম্পূর্ণরূপেতা নির্ভর করছে। আমার সঙ্গে যদি খাপ খায়, তা হলে এ কাজ চালিয়ে যেতে পারব। অবশ্য সঠিক এখন কিছুই বলা যায় না, এখনও সে আমার কল্পনার বস্তু, তার সঙ্গে আমার তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা এখনও হয় নি। যাই হোক্ দুজনকেই উপস্থিত সাংহাই নিয়ে যাব। সেখানে আমার কাকা আফে আছেন। তাঁর সঙ্গে কিছু বৈষয়িক কাজকর্ম বোঝাপড়া করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য সবকিছু সুষ্ঠুভাবে মিটে গেলে আমি মুক্ত, তোমার সঙ্গে তখন যোগ দিতে পারব। তুমিও আমার সঙ্গে সাংহাই চল না।'

'না, তা বোধ হয় পারব না। আমায় যুদ্ধের অঞ্চলে যেতে হবে।'

'পোয়া ঘড়ি দেখে বলে উঠলো, 'দশটা বেজে গেলে আর রাস্তায় বেরুতে পারবো না।' লাওপেঙ্‌ বন্ধুকে এগিয়ে দিতে দরজা পর্যন্ত এ'ল। পোয়ার বেরুবার সময় লাওপেঙ্‌ তার কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল, 'আচ্ছা মালিন দেখতে কি রকম?'

'অর্থাৎ!'

'মানে কি ধরণের মেয়ে সে?'

'পোয়া একটু অবাক হয়ে উত্তর দিল, 'একটি ছোট্ট পাখী, হাতে করে যব-কণিকাটি পর্য্যন্ত চঞ্চুপুটে তুলে ধরে খাওয়াতে হয়।'

'পরিষ্কার হ'ল না।'

'কি বলব! সব সময়ই তার ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে আছে আর প্রায়ই দাঁত দিয়ে নখ কাটে।'

একটু থেমে মানস চক্ষে মেয়েটিকে একবার দেখবার চেষ্টা করে লাওপেঙ বলল, 'যতদিন পর্যন্ত তার সম্বন্ধে মন্দ কিছু ভাবতে আরম্ভ না কর ততদিন পর্যন্ত তার ভালটুকুরই চিন্তা কোরো।'

'তুমি কি মুখ দেখে কিছু বুঝতে পার?'

'না।'

'কিন্তু তুমি তো তাকে দেখ নি।'

'তুমি যা বললে তাই যথেষ্ট।'

'তুমি তাকে একবার দেখবে বা আলাপ করবে?'

'তার কোন প্রয়োজন নেই।—আচ্ছা তার গলার স্বর কি রকম?'

'এক কথায় কলভাষিণী বলা যায়।'

'আর কিছু বৈশিষ্ট্য?'

'পোয়া একটু ভেবে বলল, 'তার কানের নীচে একটা লাল জতুকচিহ্ন আছে।'

এতে যে লাওপেঙ বেশী কিছু জানতে পারল মনে হ'ল না—।
উত্তর দিল 'বেশ তার সম্বন্ধে ভাল করে ভেবে দেখ। কোন্ মেয়ের মধ্যে যে কি থাকে বলা যায় না।'

॥ দুই ॥

লাওপেঙের সঙ্গে সন্ধ্যার এই আলাপ আলোচনায় পোয়ার মানসিক সাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে অন্যমনস্ক অবস্থায় অন্ধকারে রাস্তা চলছিল। কাছে যে টর্চ আছে খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ সেই পুলিসটিকে দেখতে পেয়ে তার যেন সম্বিৎ ফিরে এল। পুলিসটি শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। পোয়া তাকে সম্বোধন করে বলল 'আজকের রাত্রি কি রকম?'

পুলিসটি এগিয়ে এলো। পোয়াকে চিনতে পেরে সেলাম করে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ী ফিরছেন?'

'হ্যাঁ।' পকেট থেকে এক ডলারের একখানা নোট বের করে পোয়া তার হাতে দিল। পুলিশটি একটু ইতস্তত করে কৃতজ্ঞচিত্তে সেটি নিল। 'সাওয়ে আপনি বরাবরই অনুগ্রহ করে আসছেন।'—একটু সলজ্জ ভাবে আবার বলল 'বাড়ীতে পাঁচটা পোষ্য…। শুনছি নাকি অমাদের গেরিলারা মেনটুকুতে এসে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। আচ্ছা আসি।'

'অন্ধকার, একটু সাবধানে যাবেন।'

'টর্চ আছে।'

নিথর নিস্পন্দ রাত্রি। জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই। রাস্তা কর্দমাক্ত, তার ওপর গাড়ীর চাকার খাদ। নেহাৎ পরিচিত রাস্তা বলেই পোয়া অন্ধকারে যেতে পারছিল। তার মনে তখন নানারকম চিন্তা। পেঙ

বললে 'সে তোমার ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারেন' কিন্তু পেঙ তো মালিনকে চেনে না, জানে না…। তা হলে কি দাঁত দিয়ে নখ কাটার কোন অর্থ আছে ? না অন্য কিছু ! কই কাইনানকে ছেড়ে যাওয়ার কথাতে তো পেঙ্‌ বিচলিত হয় নি বা আপত্তি করে নি। শুধু বলেছে 'হয়ত তোমার স্ত্রী রত্নবিশেষ কিম্বা একেবারে অপদার্থ।' হয়ত বলতে চেয়েছিল 'বাজে'—শেষ পর্যন্ত একটু ঘুরিয়ে বলল। তার মনে হতে লাগল যে পেঙের সঙ্গে উপক্রুত অঞ্চলে যেতেই হবে।

…হ্যাঁ পেঙ একবার জিজ্ঞাসা করেছিল তার এই প্রেম ও রণনীতি সংক্রান্ত কার্যকলাপ এক সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না। কাইনান তো যাবে না—মালিন কি যাবে ? বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছতেই তার চিন্তাজাল ছিন্ন হল। দরওয়ান অপেক্ষা করছিল, দরজা খুলে দিল। পোয়া ভিতরে ঢুকলো।'

বাড়ীটি বিরাট ও নির্জন। বাইরের জগতের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্ক নেই। এই প্রিন্সেস গার্ডেনে ঢুকলে অপরিচিত লোকের গা ছম্‌ ছম্‌ করে ওঠে। পিপিঙের পতনের পর পোয়ার আত্মীয় স্বজনের প্রায় সকলেই দক্ষিণাঞ্চলে চলে যায়। পোয়ার ঠাকুরমার ভাই, বৃদ্ধ ফেঙ্‌, তাঁর স্ত্রী, তার দুই ছেলে তান্‌ এবং সিয়েন, সিয়েনের বউ লোলা, মিষ্টার ও মিসেস্‌ টাঙ্‌ আকের শ্বশুর শাশুড়ী, পোয়া নিজে এবং তার বউ কাইনান এবং জনকয়েক চাকর এই বাড়ীতে উপস্থিত বাস করে। দাদু ফেঙের বয়স ষাট ছাড়িয়েছে। অত্যন্ত ভীতু ও হুঁসিয়ার লোক তিনি। জাপানী জুজুর ভয়ে সর্বদাই অস্থির। তাদের শত্রু বলতে ভয় পান, কর্তৃপক্ষ বলেন। সর্বদাই তিনি সকলকে সাবধান হয়ে চলতে উপদেশ দেন। যখন তখন টেলিফোন ব্যবহার করা নিষেধ ছিল তার, কারণ ফোনে কখন কে বেফাঁস আলাপ আলোচনা করবে। তাঁর কড়াকড়িতে কেউ স্বাধীন ভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারত না। কেবল পোয়ার বেলায়

এই কড়াকড়ি একটু কম ছিল। তিনি সকলকে বলতেন, 'কি কঠিন সময়ে তোমরা এখানে বাস করছো তা জানো না, আমেরিকার নিশানটি না ওড়ালে হয়ত বাসই করতে পেতে না এ বাড়ীতে। যে কোন সময়ে কর্তৃপক্ষ দখল করে নিয়ে সৈন্যদের থাকবার ব্যবস্থা করতে পারে।...' ইত্যাদি। বাড়ীটি আসলে আওবংশের। পোয়া এই বংশের উত্তরাধিকারী। অবশ্য কর্তা বলতে দাদু ফেঙ্‌কেই বুঝাত। পোয়াকে তিনি নিজের ছেলের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন।

বাড়ীর ভেতরে দালানের দিকে যেতেই পোয়া বুঝলো যে মাজুং খেলা হচ্ছে। পোয়া বড় একটা এ সব খেলাধূলায় যোগ দিত না। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করত। রণনীতি দেশের অবস্থা ইত্যাদির চিন্তাতেই তার সময় কাটত। কাইনান কিন্তু মোটেই এ সব পড়াশুনা ও রণ-নীতি নিয়ে মাথা ঘামাতো না। খেলা ধূলা নিয়েই থাকত। লোলা ও মালিন যখন থেকে এখানে বাস করতে আরম্ভ করল, তখন থেকে যেন পোয়ার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। মালিন আসার পর অনেক দিন সে খেলায় যোগ দিয়েছে। খেলার জায়গায় যেতেই মালিন তাকে অভ্যর্থনা করে বলল 'আসুন আসুন—আমাদের সঙ্গে খেলুন না।'

লোলা বলল 'দাদু তোমার খোঁজ অনেকবার করেছেন'। কেবল কাইনান পোয়ার উপস্থিতিতে কোনরকম উচ্ছ্বাস বা আগ্রহ প্রকাশ করল না। পোয়াকে দেখে মালিন যেন একটু বেশী উৎফুল্ল হয়ে পড়েছিল। ঘাড় দুলিয়ে সহাস্য দৃষ্টিতে সে পোয়ার দিকে তাকাল। তার চোখে মুখে যেন কিসের একটা ভাব ফুটে উঠেছে। ভরা যৌবনের উচ্ছ্বাস-দীপ্ত সপ্রতিভ এই মুখ। হয়ত এ মুখ প্রেমের অভিব্যক্তি জ্ঞাপন করে, ভালবাসার কাছে আত্মনিবেদনের নীরব সম্মতি জানায়।

'একটা চেয়ার নিয়ে বস না। আমার বা জিমির হয়ে গেলে তুমি খেলবে।' লোলা বলল।

লোলার বয়স খুব বেশী নয়, পঁচিশ বছর। খুব মিশুক সে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নিঃসঙ্কোচে মিশতে পারে। একটু বেশী মাত্রায় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। তার ধারণা মেয়েদের স্বর্গ বলে যদি কিছু থাকে তা হল ইউরোপ। সেখানে মেয়েদের পরাধীন করে রাখা চলে না। মেয়েরা গাড়ী, বাড়ী, সাড়ী সব কিছু পায়, অবাধে চলাফেরা করে বেড়াতে পারে; নিজেদের বৈশিষ্ট্য যে ভাবেই হোক্ ফুটিয়ে তুলবার সুযোগ, নিজেকে জাহির করবার সুবিধা তারা পায়। আরও কত কিছু সুযোগ সুবিধা তারা পায় যা এই সব সেকেলে ধরণের চীনামেয়েরা কল্পনাও করতে পারে না। পুরুষকে যথাযোগ্য সম্মান সেখানে না করলেও চলে, স্বামীর ওপর পুরো-মাত্রায় খবরদারী করা চলে, কার সঙ্গে প্রেম করছে, কে কার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাকে তার বেশী ভাল লাগে এ সবের কৈফিয়ৎ স্বামীকে দিতে হয় না—উল্টে স্বামীর গতিবিধির ওপর মেয়েরা নজর রাখে, তার সকল গোপন চিঠিপত্র পর্যন্ত মেয়েরা দেখতে পারে, কিন্তু উল্টোটা ভাবাও স্বামীর পক্ষে মহা অপরাধ বলে গণ্য হয়। সেখানকার মেয়েরা সত্যিই মেয়ে, এখানকার মেয়েরা খেলার পুতুল। এজন্যেই পাশ্চাত্য স্ত্রী-সভ্যতার ওপর তার এত মোহ। সে তার স্বামীর নাম 'তান্' হতে 'ডন্' করে নিয়েছে, স্বামীর ভাইয়ের নাম 'সিয়েন' বদলে 'জেম্স' করেছে, আর তার নিজের নামের তো প্রশ্নই ওঠে না—লোলা চীনা নাম নয়। পাশ্চাত্য দেশে নাকি বলে লেবুর রসে যথেষ্ট ভিটামিন 'সি' আছে। সেই জন্যে আজকাল সকালে বিকেলে লোলা লেবুর রস খাওয়া ধরেছে। কিন্তু তাই বলে লোলা আধুনিক মেয়েদের মত মেয়েদের ভোটাধিকার, সমাজনীতি, রাজনীতি বা দেশের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত। কি পাইনি তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই, যেটুকু পেয়েছে তাই নিয়েই সে মশ্গুল। এক কথায় জীবন তার কাছে বেশ সহজ সরল হয়ে দেখা দিয়েছে।

পোয়া বসে বসে খেলা দেখছিল। সকলেই পোয়ার উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ। লোলা ইত্যবসরে ঝিকে পাঠিয়েছে দাদুর কাছে—পোয়ার ফিরে আসবার সংবাদ দিতে। পোয়ার দৃষ্টি কিন্তু মালিনের ওপর। মালিনের বয়স অনুমান বাইশ বছর। মালিন বেশ সেজেগুজেই ছিল। অন্যদিনকার চেয়ে আজ তাকে দেখতে ভালই লাগছিল। সকলেই পোয়ার সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে কথা বলছিল, কেবল কাইনান কোন কথাই বলে নি। খেলার দিকে মালিনের কোন লক্ষ্যই ছিল না। কাইনান একটু রেগে বললো 'কি, খেলবে না নাকি?' মালিন উত্তর দিল 'আজ আর ভাল লাগছে না।' পোয়ার দিকে চেয়ে বললো 'আমায় রেডজেডের ফটোখানা দেখাবেন? আমি এলব্যামের মধ্যে সুন্দর একখানা ছবি দেখেছিলাম, সেইখানাই কি রেডজেডের?' পোয়া উঠে একখানা এলব্যাম টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে পাতা উল্টাতে লাগল। মালিন এসে তার পাশ ঘেঁসে বসলো ছবি দেখবার জন্য। হঠাৎ একখানা ছবি দেখে মালিন বলে উঠল 'এইখানা কি?' ছবি দেখিয়ে পোয়া রেড-জেডের কাহিনী বললে। প্রেমের জন্য রেডজেড আত্মহত্যা করেছিল। মালিন অত্যন্ত উৎসুক হয়ে শুনছিল। পোয়া তাকে জিজ্ঞাসা করল 'আচ্ছা রেডজেডের বিষয় জানতে তোমার এত আগ্রহ কেন?'

'কারণ তাকে আমার খুব ভাল লাগে। তার জীবনে যেন একটা নতুনত্ব আছে। প্রেমের জন্য সে নিজেকে আহুতি দিয়েছে। শুনেছি তার একখানা বড় ছবি আছে, সেখানা আমায় দেখাবেন। লোলার মুখে তার কথা অনেক শুনেছি—ছবিখানা দেখতে ইচ্ছে হয়।'

'আচ্ছা, আগামীকাল তোমায় সেই ছবি দেখাব।'

পরদিন সকালে পোয়া প্রথমে দাদুর কাছে গেল। কথাপ্রসঙ্গে দাদু বললেন 'জান তো আজকাল আমরা কি রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছি। এরকম ক্ষেত্রে মেয়েদের সরিয়ে দেওয়াই ভাল।

ঐ যে মেয়েটি লোলার বন্ধু...' দাদু মালিনের কথা তুললেন, 'আজকাল আমাদের সঙ্গে বাস করছে—আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। পরের মেয়ের দায়িত্ব নেওয়া—আজকাল যেরকম বিপদ আপদ... মেয়েটি কতদিন থাকবে?'

দাদুকে এইসব দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য পোয়া বলল 'তার জন্য দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। সে সাংহাই যেতে চায়, সঙ্গী পাচ্ছে না বলে যেতে পারছে না। কাইনানও বাপের বাড়ী যেতে চাচ্ছে। আমি ভাবছি, দুজনকেই সাংহাই রেখে আসি।'

'তাই কর। যত শীগ্‌গির পার মেয়েদের এখান থেকে সরাও। দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাক।'

এই কথা শুনে মিসেস্ ফেঙ স্বামীকে বললেন—'তোমার এরকম কথা বলা অন্যায়। লোলা শুনলে কি ভাববে বল দিকি? পোয়া, তুমি যেন বলো না তোমার দাদু এ কথা বলেছেন। যে ভাবে বলা দরকার তুমি গুছিয়ে বলো।'

সেখান থেকে উঠে পোয়া লোলার ঘরের দিকে চললো। মালিনকে ছবি দেখাবার কথা আছে। লোলার কাছে মালিনকে মিলতে পারে। মালিন, লোলা ও তান তখন প্রাতরাশ শেষ করে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করছিল। মালিন বলছিলো 'আমাদের সৈন্যরাও জানে কি ভাবে যুদ্ধ করতে হয়।'

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে তান্ বললে 'কি রকম?...আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধ করবে?—তাহলে আর ভাবনা কি। কই, জাপানী জাহাজ যখন ওয়ামপুতে দুমাস ছিল, তখন তার ওপর বোমা ফেলেনি কেন?'

'কিন্তু একদিন রাতে সেটাকে মাইন দিয়ে ওড়াবার চেষ্টা করেছিল।'

'হ্যাঁ, সে চেষ্টার কোন মানেই হয় না। তাদের বোটখানার ওপর

সার্চলাইট পড়তেই ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়ে যথাস্থানে মাইন না রেখেই সুইচ টিপে দিলে ; ফলে আমাদের নিজেদের লোকই মারা গেল। আমাদের সৈন্যদের কোনরকম শিক্ষাই নেই। আধুনিক যুদ্ধ সম্বন্ধে তারা একেবারে অজ্ঞ। আমি যদি জাপানী জেনারেল হতাম, তা হলে সাংহাই নিয়ে আমি যুদ্ধই করতাম না, সোজা ইয়াংসী নদী ধরে এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতাম।'

ঠিক সেই সময় পোয়া উপস্থিত। তান্ হঠাৎ থেমে গেল। মালিন সহাস্য দৃষ্টিতে পোয়ার দিকে তাকাল।

'কি? তোমরা বুঝি যুদ্ধের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলে?'

তান্ একটু লজ্জায় পড়ে গেল। সে সচরাচর পোয়ার সঙ্গে যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে না। মালিন উত্তর দিল 'ইনি বলছিলেন, আমাদের সৈন্যরা অশিক্ষিত আর আধুনিক যুদ্ধ সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না।'

'ঠিকই তো, তারা এই যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। শত্রুপক্ষের শক্তি, তাদের রণনীতি সম্বন্ধে এরা একেবারে অজ্ঞ। এই কারণে শত্রুর কাছে মার খাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এরা কিছুই বুঝতে পারে না। তারা এখনও জানে না, ভবিষ্যতেও জানবে না। এবং এই কারণেই তো তারা যুদ্ধ করে যেতে পারবে।'

পোয়ার এই কথায় তান খানিকটা সাহস পেল। সে পোয়ার কথার উত্তরে বলে উঠল—'তা হলে চিয়াংকাইশেক এইভাবে আমাদের সৈন্য নষ্ট করছেন কেন? ডিভিসনের পর ডিভিসন সৈন্য কয়েক দিনের মধ্যেই সাবাড় হয়ে যাচ্ছে শত্রুদের হাতে।'

পোয়ার এ নিয়ে বাদানুবাদ করবার ইচ্ছে ছিল না। সে আলোচনা থামাবার জন্য বলল 'তার কারণ নিশ্চয়ই আছে, তবে কারণটা রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক। সামরিক উদ্দেশ্যও এর পেছনে

রয়েছে। যুদ্ধের সব চেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে নৈতিক বল,—জনসাধারণের মনোবল। বহুলোক মারা যাচ্ছে হয়ত, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের মনোবল ও নৈতিকবল তাতে বাড়ছে। এ যুদ্ধ অল্পদিনে শেষ হবে না—বহুদিন চলবে।' পোয়া আর অপেক্ষা না করে মালিনকে বলল 'কই, তুমি ছবি দেখতে যাবে না? লোলা তুমি যাবে?'

'না, আমি তো অনেকবার দেখেছি।'

পোয়ার সঙ্গে যেতে যেতে মালিন বলল 'তানের কথা শুনলে গা জ্বালা করে।'

'কেন, সে কি বলছিল?'

'বলছিল, সে যদি জাপানী জেনারেল হ'ত তা হলে সাংহাই ছেড়ে দিয়ে ইয়াংসী নদী ধরে এগিয়ে গিয়ে পেছনের যোগাযোগ ছিন্ন করে দিত।'

'তোমার কি মনে হয় যে এ এতই সোজা!'

'মোটেই না। আসলে—তার বলার ভঙ্গীটাই আমার ভাল লাগেনি।'

'তুমি বোধহয় তাকে দেখতে পারনা মোটেই—সেই জন্য।'

'না, তা নয়। সে নিজেকে সবজান্তা মনে করে।'

'তার ভাইকে তোমার কেমন লাগে?'

'জিমির কথা বলছেন?'

'তার নাম সিয়েন, তাকে তাই বলেই ডেকো।'

মালিন একটু অপ্রতিভ হয়ে পোয়ার দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল দুজনের।

'আমার মনে হয় সে আমার প্রেমে পড়েছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'মেয়েরা ওসব সহজেই বুঝতে পারে।'

'তোমার আশা করি কোন আপত্তি নেই—' বলে পোয়া মালিনের দিকে তাকাতেই আবার পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হল। মালিনের ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমি মাখা সূক্ষ্ম হাসি।

'সে বড্ড ছেলেমানুষী করে, বড্ড বেশী ভাবপ্রবণ......আর কথায় কথায় মেয়েদের মত লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।'

পোয়ার একটা দীর্ঘশ্বাস আপনা হতে বেরিয়ে এ'ল। তার মনে হল প্রেমের পাত্র হিসেবে সিয়েন অপেক্ষা সে বোধ হয় যোগ্যতরই।

'জিমি,—আপনার সিয়েন এমন বিশ্রী ভাবে চুল আঁচড়ায়।'

এইরূপ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে পরস্পরের পরস্পরকে ভাল লাগাটা আরও নিবিড় হয়ে আসছিল। তৃতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করার অপর একটা দিক হচ্ছে উভয়ের উভয়কে মেনে নেওয়া এবং আনুগত্য স্বীকার করা। বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর এ একটা সুন্দর পথ। উভয়ে যদি কোন একজনকে অপছন্দ করে এবং তাকে অপছন্দ করাকেই কেন্দ্র করে কথাবার্তা চালাতে থাকে তা হলে স্পষ্টই ধরে নেওয়া যায় যে দুজনে দুজনকে পছন্দ করে।

তারা ঘরের সামনে এসে গিয়েছিল। তালাখুলে পোয়া ভারী দরজাটা ঠেলে দিল। ঢুকতে গিয়ে মালিন চৌকাঠে হোঁচট্ খেয়ে পড়বার উপক্রম হতেই পোয়া তাকে ধরে ফেলল।

'লাগেনি তো?'

'না' সলজ্জভাবে হেসে উত্তর দিল মালিন।

পোয়ার বুকের মধ্যে তখনও ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। ঘরটা অন্ধকারই বলা যায়। পোয়া মালিনকে ছবিগুলি দেখাতে লাগলো। কোনটা কার ছবি, কার জীবনের কতটুকু উল্লেখযোগ্য সবই পোয়া মালিনকে বলছিল। হঠাৎ মালিন জিজ্ঞাসা করল 'আচ্ছা, আপনার ঠাকুমার কোন ছবি তো দেখছি না।'

পোয়ার মুখের ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল। সে পাল্টা প্রশ্ন করল 'আচ্ছা আমার পরিবারের সকলের সম্বন্ধে জানবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন?'

'কি জানি?......এই বিরাট পরিবারের কাহিনী শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। তাছাড়া আগেকার দিনের কথা শুনতেই আমার ভাল লাগে। আমাদের সময়টা কিরকম! বড় দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।'

পোয়ার মনে হল এখানেই মালিনের সঙ্গে কাইনানের পার্থক্য। মালিনের ভাল লাগে আগেকার দিনের কথা শুনতে, আর কাইনানের ঠিক উল্টোটি। আধুনিকতার মধ্যে সে একেবারে ডুবে গেছে।

'যাক ওসব কথা এখন থাক। আমার একটা কথার উত্তর দাও। তুমি দাঁত দিয়ে নখ কাটো কেন?'

মালিন হেসে বললো 'তা বলতে পারি না, হয়ত নেহাৎই অভ্যাস।'

'তুমি এখন কি ভাবছো?'

'আপনাদের পরিবারের কথা।'

দুজনে কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে এসে পড়েছিল। পোয়া বলছিল 'সেই পুরান দিনের সবই আছে,—নদী, পর্বত, বাগান, বাড়ী, সবই। বসন্তও তখনকার মতই আসে—কেবল তখনকার মানুষ আর নেই। আমরা হচ্ছি এযুগের।'

আমরা কথাটি পোয়া একটু জোর দিয়েই বলেছিল। এই আমরার মধ্যে বোধ হয় মালিনও ছিল। বোধ হয় প্রেম নিবেদনের এ একধরণের গৌরচন্দ্রিকা।

মালিন হেসে জিজ্ঞাসা করল...'আমরা কেন?'

একটু চুপ করে থেকে পোয়া বলল 'এই বাগানে বসে কত প্রেমিক প্রেমিকা কুজন গান গেয়েছে, অর্থহীন ভাবে ভরা ভাষার কাকলীতে বসন্তের বাতাসকে চঞ্চল করে তুলেছে। আজ সেই বাগানে

আমরা দুজনে'...মালিন নিরবে শুনছিল—'প্রত্যেক যুগের মানুষের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের ভালবাসা, তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের বিবাদ-বিসম্বাদ, তাদের প্রেম ও প্রীতিতে সেই স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।...মালিন, তোমার কি মনে হয়...? আজ আমরা দুজনে এখানে...।'

পোয়া মালিনের মুখের দিকে চাইলো; সন্তর্পণে হাতখানা তার কাঁধের ওপর রাখলো। মালিনের সারাদেহে একটা শিহরণ খেলে গেল। মালিন ধীর ও মৃদু ভাবে বলতে গেল—

'আপনার স্ত্রী...।'

পোয়া বাধা দিয়ে বলল 'তাঁর কথার কোন্ প্রয়োজন নেই।'

'তবুও সে...।'

'তাকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

পোয়া মালিনের মুখখানা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল। মালিন কোনও আপত্তি জানাল না। মালিনের চুলের গন্ধ লাগছে পোয়ার নাকে। সত্যিই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই বোধহয় প্রকৃতির চিরন্তন রীতি। প্রেমের অভিনয়ে মেয়েদের এইটেই হ'ল বৈশিষ্ট্য। তারা প্ররোচিত করে; কিন্তু এমন একটা ভাব দেখায় যেন তারা নিজেরাই প্ররোচিত হচ্ছে। হয়ত সেটা তাদের স্বভাবসুলভ লজ্জা—হয়ত বা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই পোয়া যখন তার মুখখানা তুলে ধরে তার ওপর ঝুঁকে পড়লো তখন মালিনের চোখদুটি নিমীলিত হয়ে এল। এর জন্য সে যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল—বোধহয় এইরকমটিই সে চাচ্ছিল।

'কই তোমার কথা তো আমায় আজ পর্যন্ত কিছুই বল নি!'

'বলবার মত কিছুই নেই। সে ভাল লাগবে না।'

'তুমি এক অদ্ভুত মেয়ে! কিন্তু তোমার বিষয়ে সব জানতে আমার ভারী ইচ্ছে হয়।'

'সত্যিই আমার বলবার মত কিছু নেই। রাগ করলে?'

'না না, তুমি যেমনটি এই রকমটিই আমার ভাল—এর বেশী কিছু জানবারও আমার প্রয়োজন নেই।'

'চল এবার যাওয়া যাক্।'—মালিন নিজেকে পোয়ার বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়াল।

॥ তিন ॥

বিকেল বেলা। ড্রেসিং টেবিলের সুমুখে কাইনান প্রসাধনে ব্যস্ত। কাইনান সুন্দরী, কিন্তু মুখখানা যেন একটু বড়।—তার, চুলগুলি বড় বিশ্রী, কিছুতেই মানানসই হচ্ছে না। মালিনের চুলগুলি সুন্দর। নানা ভাবে আঁচড়ে দেখে,—কোনটাই মনের মত হয় না। চুলের জন্যেই মুখখানা যেন আরও বড় দেখাচ্ছে। উঠে আয়নার সামনে দাঁড়াল—না, আজ যেন আরও বেশী লম্বা দেখাচ্ছে নিজেকে।—

এমন সময় পোয়া এসে ঘরে ঢুকল—তার মাথায় তখনও মালিনের চিন্তা পাক খাচ্ছে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। কিন্তু, কই, কোন দোষই তো করেনি।...প্রথম প্রেম নিবেদন করেছে! সে আর এমন কি দোষের—? কাইনানের উপর অবিচার করেছে?—নাঃ, মালিনকে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলা যাচ্ছে না।

কাইনান একটু অবাক হয়েই বলল 'তুমি যে এর মধ্যেই ফিরলে?'

'হ্যাঁ, মালিন ছবি দেখতে চেয়েছিল, তাই তাকে ছবি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

কাইনান উঠে এসে একটা চেয়ারে বসল। একখানা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় যে আমাদের

পরিবারের সবকিছু জানবার জন্যে মালিন আন্তরিক ভাবে উৎসুক ? তার সঙ্গে আমাদের তো কোন সম্পর্কই নেই !'

'তা কি করে বুঝব বল। মনে হয় লোলার কাছে রেড জেডের কথা শুনেই সে তার ছবি দেখতে চেয়েছিল।'

'আচ্ছা, মেয়েটি কে ?'

'তা জানি না, লোলার বন্ধু, লোলার সঙ্গেই এসেছে। জানবার মধ্যে তার নামটাই শুধু জানি।'

'এখানে কতদিন থাকবে ?'

'তা বলতে পারিনা। শুনছি সাংহাই যাবে। সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করছে। আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গেও যেতে পারে।'

কাইনান পোয়ার দিকে চাইল। 'তুমি কি মনে কর যতটা অসহায় বলে তাকে মনে হয়, সত্যিই সে ততটা অসহায় ? যে মেয়ের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই সে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারে।'

'তুমি কি করে জানলে যে তার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই ?'

কাইনান রাগ চেপে বললে 'তার আত্মীয়স্বজন আছে কি না তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আতিথেয়তার একটা সীমা আছে। আমরা দক্ষিণে যাব তারপর সে যতদিন খুসী লোলার সঙ্গে বাস করুক। কিন্তু তার সঙ্গে আমি যাব না।'

পোয়া হঠাৎ চটে উঠল, 'তুমি তার সঙ্গে যাবে না, বেশ, আমি যাব।'

এ নিয়ে পোয়ার সঙ্গে বাদানুবাদ করবার প্রবৃত্তি হল না কাইনানের। সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পোয়ার মনে হল সত্যিই সে একটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছে।

কলেজে পড়বার সময় কাইনানের সঙ্গে পোয়ার আলাপ। কাইনানকে সুন্দরী আখ্যা দেওয়া যায়—অটুট স্বাস্থ্য আর প্রত্যেকটি অঙ্গের গঠন সৌষ্ঠব বাস্তবিকই লোভনীয়। তার ওপর সে আধুনিক

মেয়ে। খেলাধুলোয়, সামাজিক আদবকায়দায়, লোকের সঙ্গে মেলা-মেশায় কাইনান অনেককেই হার মানিয়ে দেয়। পোয়া মুগ্ধ হয়েই তাকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই তার মনে হল যে তার বিবাহিত জীবন একটা বিরাট ব্যর্থতা। তাদের কোন ছেলে মেয়ে হয় নি। তারজন্যও পোয়ার আফশোষ। পোয়ার ধারণা ছিল—বিয়ে করতে হলে লেখাপড়া জানা, খেলাধুলো জানা সামাজিক আদবকায়দা দুরস্ত আধুনিক মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত। কিন্তু এই ক'বছরের মধ্যেই তার সে ধারণা বদলে গিয়েছে। আজ তার মনে হয় লেখাপড়া না জানা কোন গাঁয়ের মেয়েকে বিয়ে করলে হয়ত তার জীবনটা ব্যর্থ হত না।...আর এদিকে কাইনানও পোয়ার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হতে লাগল। অগণিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দৈনিক মদ্যপান, সিনেমা অভিনেত্রীদের সঙ্গে গোপন প্রেম ইত্যাদি কোন স্ত্রীর চোখেই ভাল লাগতে পারে না। প্রথম প্রথম কাইনান এগুলোকে বড়লোকের ছেলের সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলতা বলে ধরে নিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুঃসহ হয়ে উঠল। পরস্পরের ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়েই চলল। বর্তমানে কাইনানের জীবনের অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আধুনিকতা, ধনদৌলত আর অভিজাত সম্প্রদয়ের সঙ্গে মেলামেশা, খেলাধূলা আদর আপ্যায়ন ও ভোজ সভা। আর পোয়া ডুবিয়ে রেখেছে নিজেকে রাজনীতির মধ্যে। পোয়ার এই নঙ্গরবিহীন অবস্থা বলেই বোধ হয় মালিন তাকে এই ভাবে দোলা দিতে পেরেছে।

পোয়া কল্পনা করতে থাকে—মালিন যেন তার বিবাহিতা স্ত্রী।—না,...কাইনানের প্রতি সে অবিচার করেছে—অবিচার করছে—। আবার মালিন এসে মনের দরজায় উঁকি মারে। এভাবে বসে থাকা অসম্ভব। মনে পড়ে মালিনকে কথা দিয়েছে সন্ধ্যার পর দেখা করবে। পোয়া উঠে মালিনের ঘরের দিকে চলল।

মালিন তখন মাঝুং খেলছিল। খেলার ফাঁকে ফাঁকে সে সিয়েনকে ঠাট্টা তামাসা করছিল। পোয়া গিয়ে মালিনের পাশে বসল। ইচ্ছে করেই নিজের পা দিয়ে মালিনের পায়ে একটু চাপ দিল। মালিন কিন্তু কোন সাড়া দিল না। অর্থপূর্ণ ভাবে আড়চোখে পোয়ার দিকে চাইল। পোয়া মালিনকে বলল 'চল, একটু বেড়িয়ে আসি।'

মালিন বলল, 'একটু দাঁড়ান সোয়েটারটা গায়ে দিয়ে আসি।'

'আমি তোমার সোয়েটার এনে দিচ্ছি' এই বলে লোলা উঠে গেল এবং যাবার সময় দু'জনের দিকে একটা অর্থপূর্ণ চাহনি দিয়ে হেসে চলে গেল। ঝি এসে সোয়েটারটা দিয়ে জানাল যে লোলা সেলাই-এ বসেছে, কাজেই তারা দুজনে বেড়াতে যেতে পারে। মালিন একটু বিব্রত হয়ে উঠল 'তা কি করে হয়! চল আমরা একবার লোলার কাছে যাই।'

তার এই বিব্রত ভাব দেখে পোয়া ঝিকে বলল 'আচ্ছা লোলাকে বল আমরা সকাল সকাল ফিরব।' পোয়ার বুঝতে বাকী ছিলনা যে লোলা তাদের দুজনকে একা যেতে দিতে চায়। চলতে চলতে মালিন পোয়াকে বলল 'তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হওয়াটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়···এর আগে যে কেন আমাদের পরিচয় হয়নি···বড় বেশী দেরীতে আমাদের পরিচয়।'

দু'জন নবপরিচিতের পক্ষে এ উক্তি অর্থপূর্ণ। পোয়া ঈষৎ হেসে বললে 'আমার মনে হয় খুব বেশী দেরী হয় নি।'

পোয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই মালিন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। সে ভাব গোপন করবার জন্য একটা ফুল তুলে নিয়ে একে একে তার পাপড়িগুলি ছিড়তে লাগল।

'ওই ভাবে ফুলের পাপড়িগুলি ছিড়ছো কেন? ওতে আয়ু ক্ষয় হয়।'

একটা বড় ম্যাগনোলিয়া ছিড়ে পোয়ার হাতে দিয়ে মালিন হেসে বলল—'কতখানি আয়ু কমল আমার ?'

পোয়া বললো—'জান কবি কি বলেছেন,—

"পুষ্প ছিল বৃক্ষশাখে হে নারী তোমার অপেক্ষায়
পল্লব ছায়ায়
তোমার নিঃশ্বাস লাগি
অন্তরে সে উঠিয়াছে জাগি
মুখে তব কি দেখিতে পায় ॥
সে কহিছে বহু পূর্বে তুমি আমি কবে এক সাথে
আদিম প্রভাতে—
প্রথম আলোকে জাগি উঠি
এক ছন্দে বাঁধা রাখি দুটি
দুজনে পরিনু হাতে হাতে ॥
আধো আলো অন্ধকারে উড়ে এনু মোরা পাশে পাশে
প্রাণের বাতাসে।······"

কাজেই চয়নের সময় হলে চয়ন করবে বৈ কি ; তবে ফুটবার আগেই যেন ডালপালা ভেঙ্গো না।'

এর প্রচ্ছন্ন অর্থ বুঝতে মালিনের দেরী হল না···'না···আর ফুল ছিড়ব না—। মেয়েরা যা করে সবই অন্যায়।'

পোয়ার কথাটা কেমন যেন লাগল। 'তুমি ও কথা বললে কেন—মেয়েরা যা করে তাই ভুল !'

'তুমি তো আর মেয়ে নও যে বুঝবে।'

মুহূর্তের জন্য মালিনের মুখখানা বেদনাতুর হয়ে উঠল। এই ভাব গোপন করবার জন্য মালিন ছেলেমানুষী করতে আরম্ভ করল।··· মালিন হাসতে হাসতে ছুটে এগিয়ে গেল···পোয়া লঘুপদে ধাওয়া করল।

মালিনের হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলে বললে, 'কেমন ধরে ফেলেছি···।'

'আমি কি পালাচ্ছিলাম যে—ধাওয়া করে এসে ধরে ফেলেছ···।' কথা শেষ হবার আগেই হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ছুট্। পোয়া আবার তাকে ধরে বলল 'এবার কি হল ?'

সঙ্কোচ ও অনুরাগে মালিনের মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠেছে। পোয়া বলল, 'এইবার এইখানে বসা যাক্। আজ যে তোমার বেশ স্ফূর্তি দেখছি ! কি ব্যাপার ?'

'এমনিই।'

···কিন্তু একি ! একটু আগেকার মালিন এ নয়। তার চোখে মুখে—এক বিষাদক্লিষ্ট, অবসাদের ছায়া।···

'মালিন, আমার সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলবে না ? তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা সহজবোধ্য নয়। তুমি একটু আগে ওকথা কেন বললে···মেয়েরা যা কিছু করে সবই অন্যায় !'

'কেন আমি কি কিছু ভুল বলেছি ?'

'তা জানি না। তবে তুমি ওকথা বললে কেন ?'

'অভিজ্ঞতা হতে বুঝেছি···।'

'অভিজ্ঞতা !'

মুখখানা তুলে মালিন পোয়ার মুখের দিকে চাইল সুদৃঢ় ও সদর্প ভঙ্গীমায়। পোয়ার সব ধারণা, সব বিশ্বাসকে বানচাল করে দেবার জন্য এ যে এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান। কিন্তু পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল—মুখে শান্ত ও শ্রান্ত ভাব ফিরে এল। অস্তোন্মুখ রবির সোনালী আভায় মুখখানা তার কমনীয় হয়ে উঠেছে।'

'আচ্ছা মালিন···তোমার নিজের সম্বন্ধে তো আমায় আজ পর্যন্ত কিছুই বল নি।'

'আমার সম্বন্ধে ! কি বলবো !'

'ধর তোমার পরিচয়, তোমার বাবা মা কোথায় ?'

'এই ধরুন—আমার নাম মালিন, পদবী স্থই ।'

'তা জানি—তা ছাড়া বল ।'

'তা ছাড়া বলবার কিছু নেই ।'

'না, না, নিজেকে রহস্যাবৃত করবার চেষ্টা কর না। তোমার বাবা মা কোথায়— ?'

'আমার বাবা মা নেই ।'

'লোলার সঙ্গে তোমার পরিচয় কি ভাবে হ'ল। স্কুলে একসঙ্গে পড়তে ?'

'না আমি কোন দিন স্কুলে পড়ি নি। ···ছোটবেলায় কয়েকদিনের জন্যে স্কুলে গিয়েছিলাম ।'

'আচ্ছা, তুমি নিজের কথা কিছু বলতে চাও না কেন বলত ?'

হেসে মালিন পোয়ার দিকে চাইল—চোখে তার দুষ্টুমি মাখা চটুলতা। সে চাহনিকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

'আমার সম্বন্ধে তুমি কি জানতে চাও ?'

'তোমার বাবা মা নিশ্চয়ই ছিলেন—তুমি তো আর আকাশ থেকে পড় নি !'

'হুঁ, তা হলে শোন—আমার বাবা ছিলেন একজন সামরিক কর্ম্মচারী···তাঁর নাম আমি বলব না···মার নাম ছিল স্থই··· ।'

'তুমি যেন রূপ কথা বলছ ।'

'তোমার যা মনে হয় ভাবতে পার। ···আমার বাবা মাকে ত্যাগ করেন। মা আমাকে নিয়ে খুবই অভাবের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। আমার বয়স যখন সতের, তখন মা মারা যান।' মালিন চুপ করল।

'তারপর ?'

'সেই সময় আমার বাবাকে হত্যা করে।'

'কে হত্যা করে ?'

'তার নাম বলতে পারবো না। তিনিও অনেককে হত্যা করেছিলেন। লোকে তাঁকে ঘৃণা করত।...'

'বাবার উপর তোমার কোন সহানুভূতিই নেই মনে হচ্ছে।'

'না, কোন দুঃখই আমার নেই তাঁর জন্যে। কি জন্য থাকবে! তারপর দুনিয়ায় আমি একা। একটা ছেলে আমার প্রেমে পড়ল। সে এক মজার ঘটনা।... বোধ হয় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা যদি বলি আমি বিবহিতা ?'

'তাতে আমার আরও ভাল লাগবে।...আচ্ছা তোমার বয়স কত ?'

'পঁচিশ বছর।'

'সে ছেলেটি আমায় লেখাপড়া শেখাতে চাইল। আমার কাছে প্রায়ই আসত সে! ...শেষ পর্যন্ত তার বাবার জন্যে আমায় সরতে হ'ল।'

'তারপর ?'

'তারপর সে এক নারকীয় পর্ব। ছেলেটি যোগাযোগ রাখলো আমার সঙ্গে এবং বাবার অমত সত্বেও আমায় বিয়ে করল। প্রথম কয়েক মাস আমরা বেশ কাটালাম। ছেলেটির বাবা ইতি মধ্যে আমার পিতৃ পরিচয় আবিষ্কার করলেন। আমার বাবা নাকি তাঁর শত্রু ছিলেন এবং বাবার পাল্লায় পড়ে একবার নাকি তিনি জেল খাটতে চলেছিলেন। লাখখানেক ডলার খরচ করে সে যাত্রায় তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। সেই কারণে আমার ওপরেই প্রতিশোধ নেওয়া স্থির করলেন।'

'ঐ ভদ্রলোকই কি তোমার বাবাকে হত্যা করেছিলেন ?'

'না, অন্য একজন। বাবার শত্রুসংখ্যা তো আর কম ছিল না।'

'হত্যাকারীর কি আদালতে বিচার হয়েছিল?'

'না, জনমত তার অনুকুলেই ছিল। তোমার কি বিশ্বাস যে আমার বাবা জাপানীদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন?'

'কিন্তু তোমার বাবা কে তা তো বল নি!'

'ওঃ...কি রকম ঘুলিয়ে ফেলেছি। ...এ পর্যন্ত তো মোটামুটি একরকম গেল। ...বাবার জন্য কোন দিনই মাথা ঘামাই নি। মা বাবাকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। কিন্তু এই শ্বশুর আমায় বিশ্বাসঘাতকের বীজ আখ্যা দিলেন। আমার জন্য তিনি ছেলের ওপর খড়্গ হস্ত হলেন। ছেলেকে বাধ্য করলেন আমায় তাঁর বাড়ী নিয়ে যেতে। সেখানে একটা ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হ'ল আমাকে। স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার অধিকারও ছিল না আমার। একমাত্র অবলম্বন কান্না আর ঘুম। কিছুদিন বাদে আমার শাশুড়ী আমার উপর কিঞ্চিৎ সদয় হলেন। তিনি শ্বশুরকে বললেন যদি তার বাবা অন্যায় করে থাকে তা হলে তার মেয়ের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে কি হবে? তা ছাড়া তার বাবা মরে গিয়েছে, এখনও শত্রুতার জের টানা কেন? লায়েনারাকে তোমার যদি ভাল না লাগে তাকে বিদেয় করে দাও, ছেলেকে আর একটা বিয়ে করতে বল।'

'লায়েনারা?'

'ওঃ—আগে আমার ঐ নাম ছিল, পরে বদলেছি।'

'তোমার শাশুড়ী লোক ভালই ছিলেন।'

'হ্যাঁ, বৌদ্ধ আর ধর্ম্ম ভীরু ছিলেন।'

'তারপর?'

'তারপর শ্বশুর আমার স্বামীকে আবার বিয়ে করতে বললেন। স্বামীও তাই করল। আমার অবস্থা তখন কি রকম একবার ভেবে

দেখ। গরু ভেড়ার পর্যায়ে নেমে এলাম আমি—স্ত্রীও নই, রক্ষিতাও নই। কি করব! তার ওপর সেই মেয়েটী অর্থাৎ আমার স্বপত্নী আমায় অত্যন্ত হিংসা করত। যাই হোক, অসহায়ের সহায় ভগবান! একদিন সন্ধ্যার পর আমার শাশুড়ী একটা প্যাকেট হাতে করে আমার ঘরে এলেন। আমায় বললেন—'লায়েনারা, তুমি এ বাড়ীতে আসার পর থেকে আমি একদিনও শান্তি পাই নি। বাড়ীতে যারা আছে তারা মানুষ নয়····· তুমি চলে যাও, তোমায় আমি টাকা দিচ্ছি—যা হয় কিছু করে খেয়ো। বোঝাপড়া আমি করব। আর তারা যাতে তোমার পেছু না লাগে তার ব্যবস্থাও আমি করব।' এই বলে মালিন থামল। ···তারপর আবার আস্তে আস্তে বলতে লাগল 'পৃথিবীতে ভালমানুষও আছে। এই বৃদ্ধা আমায় সাহায্য না করলে হয়ত আমি মরে যেতাম।'

পোয়া বিস্মিত হয়ে বলল 'তোমায় দেখলে মনে হয় না যে এত কিছু তোমার জীবনে ঘটে গিয়েছে। তারপর—তুমি কি করলে?'

'আর না—অনেক বলেছি।'

পোয়া মালিনের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিল—মালিন সাড়া দিল।

'এসব কথা কাউকে বল না।'

পোয়া আরও কাছে বসে তার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে লাগল। হাতখানা তখনও তার হাতের মধ্যে। মালিন মুখ নীচু করে বসে। মাটির ওপর নিবদ্ধ তার দৃষ্টি—অর্থহীন দৃষ্টি। থেকে থেকে বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। পোয়া দু'হাতে মালিনের মুখখানা তুলে ধরলো। মালিনের চোখে মুখে তখন কিসের এক উন্মাদনা।···উত্তপ্ত উষ্ণ ও আবেগময় সে সাড়া—পোয়ার বাহুবেষ্টনীর মধ্যে সে আরও নিবিড় ভাবে এগিয়ে গেল।···এই ভাবে কয়েক মিনিট কেটে গেল।

এক সময় পোয়া বলে উঠলো 'লায়েনারা···লায়েনারা···বেশ নামটা তো···।'

'ও নামে আমায় ডেকো না।'

'কেন?'

ও আমার ছোটবেলাকার নাম।···আচ্ছা ডাকতে পার কিন্তু কারও সামনে নয়, যখন শুধু আমরা দু'জনে থাকব।'

'তাই হবে লায়েনারা।' উভয়েই হেসে ফেলল।

'আমি তোমায় কি বলে ডাকব?'

'কেন পোয়া বলে।···তাছাড়া ভালবাসার পাত্রকে ডাকতে বাঁধাধরা নামের প্রয়োজন হয় না।'

মালিন আবার যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

পোয়া জিজ্ঞাসা করল 'কি ভাবছ বলতো?'

'ভাবছি···। দেখ সমাজ চিরকালই বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষ নিয়েছে। মেয়েদের বোধ বা বিচারশক্তি থাকা যেন অন্যায়, আর এই বোধ বা বিচার-শক্তি নিয়েই বা মেয়েরা কি করবে? একটা ছেলে যদি একের পর এক গর্হিত কাজ করে যায়—সমাজ তাকে হয়ত কোন শাস্তিই দেবে না—কিন্তু একটা মেয়ের একবারকার পদস্খলনই অমার্জনীয় অপরাধ। মেয়েদের জীবনে বিয়েটা একটা মস্ত বড় ঘটনা। তার জীবনের সব কিছুই এই বিয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকাবার—সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার পর্যন্ত তার নেই। এরপর যদি তার কোন প্রকারেও পদস্খলন হয়, তা হলে তো কথাই নেই। এই ধর তুমি আমি এখানে বসে আছি। তুমি আমায় প্রেম নিবেদন করছ, কি তোমায় প্রেম নিবেদন করছি—তা কেউ বিচার করবে না। স্বামীও আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করবে। ভুল আমারই হয়েছে

প্রতিপন্ন হবে।' মালিনের চোখে মুখে বিষাদের ছাপ। 'আমার আগের বিয়েতে লোকে বলত আমি নাকি ছেলেটাকে ফাঁদে ফেলেছিলাম, তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে তার বাবার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিলাম। আমি নাকি নির্লজ্জের মত বাবার শত্রুর ছেলেকে বিয়ে করেছিলাম।'

প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাবার জন্য পোয়া মালিনের আঙুলগুলি নাড়তে নাড়তে বলল—'মালিন তোমার আঙুলগুলি কি সুন্দর।'

মালিন হেসে তার দিকে তাকাল—'আচ্ছা পোয়া তুমি কোনো দিন কাউকে ভালবেসেছ?'

'না—জীবনে ভালবাসার অভাব আজ পর্যন্ত অনুভব করে এসেছি। অনেক মুখ সাময়িক ভাবে ভাল লাগত—কিন্তু সে সাময়িক মোহ মাত্র।'

'পোয়া, তুমি আমায় চাও কি না তাই বল। আমায় প্রেমিকা হিসেবেই রাখ আর রক্ষিতা হিসেবেই রাখ।'

পোয়া হেসে বলল 'কিন্তু সমাজে রক্ষিতার স্থান কি জানো?'

মালিন আবেগভরে বলল 'একটু খুলে বলো।'

'বিবাহিত স্ত্রীর স্থান সমাজে সুরক্ষিত। সমাজের চোখে তার স্থান অনেক উঁচুতে। স্ত্রীর স্বামীকে ভালবাসলেও চলে, না ভালবাসলেও চলে। সে মিসেস্ অমুক—এই তার সব চেয়ে বড় লাভ। কিন্তু প্রেমিকা বা রক্ষিতার সমাজে কোন স্থানই নেই। যে কোন মুহূর্তেই সে বঞ্চিত হতে পারে। তাই প্রেমাস্পদের আনন্দ-বিধানে সে এত যত্নবান। একটা প্রবাদ আছে—স্ত্রীর চেয়ে রক্ষিতা ভাল, রক্ষিতার চেয়ে চুরি করা ভাল, চুরি করার চেয়ে চুরি করার চেষ্টাকে বিফল করে দেওয়া আরও ভাল।'

মালিন হেসে বলল 'কথাটা মনে রাখব।'

'তুমি তো জান কাইনানের ওপর আমার কোন আকর্ষণ নেই। সেও তা জানে।'

'তা হলে বল সত্যিই আমি তোমায় চুরি করে নিয়েছি।'

'কাইনান সাংহাই যেতে চায়।'

'আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। —কি সে আপত্তি করবে?'

'তোমার এখানে থাকাতেও সে আপত্তি করে। ও কোন কাজের কথা নয়।'

'তা হলে?'

'সে বাপের বাড়ী থাকতে চায়। ভালই হবে। বেচারী এখানে মোটেই সুখী নয়। আমি তার ওপর বহু অবিচার করেছি।'

'তা হলে আমায় নিয়ে যাচ্ছো?'

পোয়া চিন্তিত হয়ে উঠল।

'পোয়া আমার কোন পিছু টান নেই। তুমি যেখানেই যাও না কেন, আমি সঙ্গে যাব। তোমায় না দেখে থাকতে পারব না।'

'আমার সঙ্গে সব জায়গায় যেতে পারবে? এখন দেশের অবস্থাটা খেয়াল আছে?'

'হ্যাঁ, তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

'না, এখনও তুমি আমার কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেলে।'

'এতেও প্রশ্ন কিসে আসে'—মালিনের চোখে মুখে বেদনার ছাপ। 'চল যাই। তুমি লোলাকে বলে পাঠিয়েছিলে—সকাল সকাল ফিরবে। কিন্তু কত দেরী হয়ে গেল।...আজ রাতে আমাদের সঙ্গে খেলতে আসবে না?'

'আসব—খেলতে নয়, তোমাকে দেখতে। কিন্তু হুঁসিয়ার। কোনরকম বেচাল করো না যেন—অন্তত সাংহাই যাওয়া পর্য্যন্ত।'

'চুরি করব, কেউ জানতে পারবে না—বেশ ভাল লাগে এরকম চৌর্য বৃত্তিতে।'

'লোলাকে এ সবের কিছু বল না যেন।'

'না না।'

'আমিও না।'

দুজনে ফিরে চলল।

শরতের প্রত্যূষে, ঠাণ্ডা মিঠে হাওয়া বইছে। রাতে জানালার পর্দাটা খোলাই ছিল। একটু শীত শীত করছে। চাদরটা মুড়ি দিয়ে পাশ বালিসটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে জানালার দিকে মুখ করে মালিন শুলো। ঘুমের আমেজ তখনও পুরোপুরি। গত রাত্রের কথা একটা সুখ-স্বপ্নের মত মনে পড়ছে। জীবনের বোধ হয় এ এক নূতন আরম্ভ। ...পোয়াকে কেন সে প্রশ্রয় দিল?...এর শেষ কোথায়? অতীতের বিষাদ ও বেদনাতুর দিনগুলির কথা মনে আসে। আবার মনে হয় তখন বয়স কম ছিল, সবকিছু ভাল ভাবে বুঝত না, তাই বারবার প্রতারিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। কিন্তু পোয়া...না না...সে ধাপ্পা দেবার লোক নয়—শ্রদ্ধার পাত্র সে।...না ভবিষ্যতের কোন কিছুই তার জানা নেই...। কিন্তু পোয়া কি তাকে সহজ ভাবে নিতে পারবে? অতীতের কলঙ্কিত জীবনের ইতিহাস শুনলে কি পোয়া আর ভালবাসবে তাকে?...না, ভালই করেছে পোয়াকে সব কথা না বলে।...কিন্তু মনে হয় পোয়া অকপট ভাবেই বলেছিল 'তোমাকে বিচার করতে আমি চাই না। তুমি যে রকমটি আমি সেই রকমটিই ভালবাসি।' তার কথার মধ্যে আন্তরিকতার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।...জীবনে বার বার প্রতারিত ও বঞ্চিত না হয়ে যদি প্রথমে একটা যোগ্য লোককে সে পেত, তা হলে হয়ত জীবনের মোড় অন্যদিকে ঘুরে যেত।...এ সব কি ভাবছে সে? পোয়াকে বিয়ে করার কথা? তার কি মাথা খারাপ হয়েছে...? কখন

তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। ঘুম যখন ভাঙলো তখন আটটা বেজে গিয়েছে। জানালার দিকে পরিচিত পায়ের শব্দ যেন। মুখ তুলে মালিন দেখল পোয়া চলেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে মালিন তাড়াতাড়ি পোষাক পরিবর্তন করে নিল। পোয়ার সঙ্গে জানালার ধারে দেখা করতে হবে, পারলে দু'একটা কথাও বলতে হবে। পর্দাটা আরও উঁচু করে দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মালিনকে দেখে হেসে পোয়া বলল 'চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে ঘুমটা বেশ ভালই হয়েছে। এত সকালেই উঠেছ দেখছি।'

ইসারায় মালিন পোয়াকে ঘরে আসতে বলল। পোয়া নিঃশব্দে মালিনের ঘরে এসে ঢুকল। ঘুমের পর মালিনকে আরও সজীব দেখাচ্ছিল—তার চোখে মুখে যেন তখন যৌবনের উচ্ছ্বাস ও মাদকতা। ...না ঘুমের পর এ গলা ভারী হওয়াটা বিশ্রী, ফিস্ ফিস্ করে কথা বলা যায় না। পোয়া মালিনের কাঁধের ওপর হাত রেখে নুয়ে পড়ে মালিনের ঠোঁটে একটা চুমো এঁকে দিল। মালিনের মনে যে সংশয় পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল—সব ধুয়ে মুছে গেল।

'আমাদের যাওয়া সম্বন্ধে ফেঙ্‌দাদুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে যাচ্ছি... তিনি আবার সকালেই বেরিয়ে যান কিনা।...কাইনান কিছু জিনিষপত্র কিনতে চায়। আমি বলেছিলাম যা কিনবার সাংহাই যেয়ে কিনো। কিন্তু সে বললে, আত্মীয় স্বজনদের উপহার দেবার মত দু'একটা জিনিষ এখান থেকেই কিনতে হবে। একটু পরে তাকে নিয়ে আমি বেরুব। তোমার কি কিছু কিনতে হবে?'

'না...তবে কিছু অলিভ্ ও সল্টেড গিজার্ড নিয়ে এস।'

'তুমি বুঝি গিজার্ড খেতে খুব ভালবাস?'

'হ্যাঁ—পড়বার সময় চোষা আমার অভ্যাস।'

'আশ্চর্য! আমারও ঐ একই অভ্যাস।...সাংহাই যাবার জন্য

তাহলে প্রস্তুত।…আজ এস না, আমাদের সঙ্গে খাবে। সবাই বসে এক সঙ্গে খাওয়া যাক।'

'আচ্ছা যাব।'

পোয়া চলে গেল। দিনের সূচনাটা ভালই। পোয়ার স্পর্শ আর চুম্বনের রেশ এখনও রয়েছে। সকালটাও বেশ ঝরঝরে। আয়নার সামনে বসে মালিন ভাবছে কি পোষাকে খেতে যাবে। বাড়ীতেই এক সঙ্গে খাওয়া—এর মধ্যে আড়ম্বরের কোন প্রশ্নই নেই। তবু এমন ভাবে সাজতে হবে তাকে—যা পোয়াকে আকৃষ্ট করে, যা তার ভাল লাগে।

প্রায় বারটার সময় লোলা, তান ও সিয়েনকে সঙ্গে নিয়ে মালিন পোয়ার ঘরের দিকে চলল। পোয়া ও কাইনান তখনও ফেরে নি। ঘরের আসবাব পত্র সাজানো গুছানো,—দেখলেই গৃহস্বামীর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। একটু পরেই পোয়া ও কাইনান ফিরল। আসন্ন যাত্রার আনন্দে কাইনানকে বেশ প্রফুল্লই দেখাচ্ছিল। খাবার টেবিলে কাইনান মালিনকে সিয়েনের পাশে বসতে বলল। এর আগে একদিন কাইনান লোলাকে বলেছিল—'সিয়েনের সঙ্গে মালিনকে বেশ মানায়। তাছাড়া তাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বও আছে। মালিনের সঙ্গে পোয়ার ঘনিষ্ঠতার কথা কাইনান যে জানত না তা নয়। তবে সে এর আগেও অনেকবার দেখেছে যে পোয়া মধ্যে মধ্যে ওরকম দু'চারটা মেয়েকে নিয়ে মজামেরে নাচায়। এজন্যে সে পোয়ার সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। খেতে বসে নানা কথায় কাইনান বলল 'গত রাত্রে যখন আমরা খাই তখন অনেক বন্দুকের আওয়াজ হয়েছিল। তোমরা শুনেছিলে? তাঁনগা বাজারের লোকেরা বলাবলি করছিল যে গতরাত্রে তারা একটা জেলখানা ভেঙেছে।'

পোয়া বলল 'হ্যাঁ, আমাদের লোকেরাই—গেরিলারাই কালকে এ কাজ করেছে। জেলখানাটা ইয়াংটিং মেনের পাশেই।'

কাইনান বলল—'কেউ কেউ বলছে যে প্রায় পাঁচশ কয়েদীকে তারা মুক্ত করেছে। আবার কেউ কেউ বলছে প্রায় হাজারখানেক হবে। তাদের অনেকেই নাকি গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।'

একটু চুপ করে থেকে পোয়া কাইনানকে লক্ষ্য করে বললো—'খাওয়ার ব্যাপারে আমার তো বেশ আনন্দই হচ্ছে।'

'আনন্দ কেন?'

'লোকের অন্তিম পরিণতি দেখতে পাব বলে। ইষ্ট ওয়ান পাইলো থেকে ইষ্ট ফোর্ পাইলোর মধ্যেই তো সাত আটটা হাসপাতাল হয়েছে। সেখানকার বাতাসটা পর্যন্ত বিষিয়ে উঠেছে। একটু থেমে বলল 'পিপিং এখন জাপানীদের হাতে। তারা বিজেতা, কিন্তু তারা সে ভাবে চলতে পারে না। আমাদের দেশের লোককে তারা ভয় করতে শেখাতে পারে নি, তাদের শুভেচ্ছাও তারা আদায় করতে পারে নি। নিজেদের শক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাদের নেই, অথচ শান্তিতে বাসও তারা করতে পারে না। এখানে যে সব জাপানী দোকানদার আছে, তাদের দেখে আমার মনে হয় তাদের মত হতভাগ্য বোধহয় আর কেউ নেই। একজন রিক্সাওয়ালা একদিন আমায় বলছিল—জাপানীদের সঙ্গে আমাদের কোন পার্থক্যই নেই, একমাত্র পার্থক্য যে আমরা হাসতে পারি আর তারা পারে না।...'

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। সকলে আবার পড়ার ঘরে গেল। অন্যদিন সবাই আপন আপন ঘরে চলে যেত। দুদিন বাদে কে কোথায় থাকবে তার ঠিক নেই, যেটুকু সময় এক সঙ্গে গল্প গুজবে ফুর্তি করে কাটান যায়। হঠাৎ দূরে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল। এ রকম আওয়াজে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। প্রায়শই হয়। গত দুমাস হল

গেরিলারা এদিকে এসেছে। শত্রুকে নানা ভাবে তারা বিব্রত করে তুলেছে। তবু লোলা যেন একটু শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। পোয়াকে জিজ্ঞাসা করলে—'তুমি তো চলে যাচ্ছ, আমাদের কি হবে। যুদ্ধ আর কতদিন চলবে?'

পোয়া পাইপ টানতে টানতে বলল—'দু' তিন বছর।'

'অতদিন আমাদের লোক যুদ্ধ চালাতে পারবে?'

'পারবে।'

'কিন্তু আমরা···তুমি কবে ফিরবে?'

'ভগবান জানেন। ১৯৩২ সালের সাংহাইএর যুদ্ধের মত এ যুদ্ধ অল্পদিনে শেষ হবে না।'

'আর আমাদের এইখানে আবদ্ধ হয়ে থেকে বসে বসে ঐ বন্দুকের আওয়াজ শুনতে হবে?'

'শত্রুর হাত থেকে চীনকে মুক্ত করতে হলে তা করতে হবে বৈকি। জেনে রেখো, আমাদের গেরিলারা তাদের উদ্ব্যস্ত করে তুলবে।'

'যদি যুদ্ধ এতদিন চলে, তা হলে আমাদের সাংহাই চলে যাওয়াই তো ভাল। সে জায়গাটা জাতি সংঘের অধীনে।'

'সাংহাইএর অবস্থা আরও খারাপ।'

'তা হলে তুমি যাচ্ছ কেন?'

'তোমরা ভুল করছ। এ যুদ্ধ হবে দীর্ঘ দিন স্থায়ী। ১৯৩২ সালে শুধু উনবিংশ বাহিনী যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু এবার যুদ্ধ করছে সমগ্র জাতি। কাজেই সাংহাই নিরাপদ না পিপিং নিরাপদ—সে প্রশ্নই ওঠে না। এখন অবস্থা সর্বত্রই সমান। সাংহাই কেন—দেশের সুদূর অভ্যন্তরেও এ যুদ্ধের ঢেউ লাগবে। আমাদের ভাগ্যে কখন যে কি ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে না থাকতে পারলে ভিতরের দিকে চলে যেতে পার।'

'আমি অত ভাবতে পারি নি। ভাবতাম মালিনের কথা। পলাতক আশ্রয়প্রার্থী হয়ে সে এখানে এসেছে। এখন দেখছি আমাদেরও সেই অবস্থায় পড়তে হতে পারে।'

'মালিন কি আশ্রয়প্রার্থী ?'

'যখন পালিয়ে এসে আমাদের বাড়ী আশ্রয় নিয়েছে তখন তাছাড়া তাকে আর কি বলা যায় ?'

মালিন আড়চোখে একবার লোলার দিকে চেয়ে হাসল।

পোয়া বলে চললো…'পিপিং এখন বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের লোকের যেমন অবস্থা জাপানীদেরও সেই অবস্থা। কারও মনেই শান্তি বা স্বস্তি নেই। আমাদের লোক ভাবছে তারা অজেয়। আর জাপানীরা ভাবছে যে পিপিং তো তারা প্রায় জয় করেই নিয়েছে—এখন তাকে হাতে রাখবে কামান ও বন্দুকের সাহায্যে। এজন্য তারাও অসুখী, তারাও সন্ত্রস্ত। অস্ত্রবলের ওপরই যাদের সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় তারা কখনও ভীত না হয়ে থাকতে পারে না। যে গুলি করে আর যাকে গুলি করে—উভয়েরই মানসিক অবস্থা সমান।'

তান্ হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠল—'কিন্তু ইংরেজরা তো প্রায় দুশো বছর ধরে ভারতকে পদানত করে রেখেছে কামান-বন্দুক দিয়ে।'

'না, তুমি ভুল করলে। ব্রিটিশরা ভারতবাসীদের ওপর প্রভুত্ব করছে তাদের মোহগ্রস্ত করে।'

'মোহগ্রস্ত করে ?' তান অবাক হয়ে চাইল।

'হ্যাঁ, ইংরেজরা দেখতে সুন্দর।'

'না—সমস্ত বিষয়টি আপনি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করছেন। ইংরেজদের চামড়ার রং নিয়ে হিন্দুরা মোটেই মাথা ঘামায় না। কোরিয়ার লোকেরা যেমন জাপানীদের ঘৃণা করে, ভারতীয় হিন্দুরাও সেই রকম ইংরেজদের ঘৃণা করে।'

'হ্যাঁ, হিন্দুরা তাদের ঘৃণা করে সত্যি ; কিন্তু ভয়ও করে, সম্মানও করে। এইখানেই তারা মোহগ্রস্ত। সাপ দেখলে মানুষ যেমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এ কতকটা সেই রকম। কোরিয়ায় জাপানীরা যত সৈন্য রেখেছে, সারা ভারতবর্ষে ইংরেজদের তত সৈন্য নেই। এর একমাত্র কারণ ইংরেজরা আত্মবিশ্বাসী জাতি। তারা সব কিছুতেই তাদের নিজস্বতা বজায় রেখেছে এবং ছলে বলে কৌশলে ভারতীয়দের তাদের অনুকরণ করতে বাধ্য করেছে। অন্য কোন জাত নিজের আত্মসম্মান সম্বন্ধে এতবেশী সচেতন নয়। তুমি যে কোন দেশের লোককে অন্যদেশে প্রভুত্বের পদে বসিয়ে দাও ; তারা চলা ফেরা আদব কায়দার মধ্যে সে প্রভুত্বের মর্যাদা রাখতে পারবে না।'

'তা হলে ইংরেজদের তুমি বেশ পছন্দ কর ?'

'হ্যাঁ, করি। জাতি হিসাবে বা ব্যক্তি হিসাবে তাদের শ্রদ্ধা করি কিন্তু তাদের বৈদেশিক নীতিকে ঘৃণা করি।'

'কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির আবার ভাল মন্দ কি ? সিঙ্গাপুর ও হংকংএর দিকে তাকাও। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও সাউথ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। আবার সুদূর প্রাচ্যে নিজ স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখবার জন্য তারা জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতাও করছে।'

'অতি সত্যি কথা ; কারণ তাদের সাম্রাজ্যবাদ আরও সাংঘাতিক। তারা জানে কি ভাবে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হয়। গত ষোড়শ শতাব্দীতে তারা এই পথে এসেছে এবং সুষ্ঠুভাবে তাদের নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। সেই তুলনায় জাপানীরা শিশু। পররাজ্য শোষণ করবার কৌশল জাপানীদের জানা নেই। এখনও তাদের দুশো বছর লাগবে এই সাম্রাজ্যবাদকে অস্থি মজ্জাগত করতে। শুধু কামান-বন্দুক দিয়ে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা যায় না। সাম্রাজ্যবাদ কলা-বিদ্যার মত আয়ত্ব করতে হয়।'

'এ কথা মানতেই পারলাম না। কাঁচামাল, বাজার, চাহিদা, আর যোগান এই নিয়েই সাম্রাজ্যবাদের নীতি। কলাবিদ্যার সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্যই নেই।'

'কলেজে অবশ্য তাই পড়ায়। এগুলোও সত্যি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার সঙ্গে শিখতে হবে কি করে খরিদ্দার হাত করতে হয়। সেই জন্যই বলছিলাম সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে সুচতুর কৌশল—, যে কৌশলের সাহায্যে মানুষ বশ করা যায়,—বিশেষত ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন আচার ব্যবহারাবলম্বী লোককে বশ করা যায়। এবং তা করতে হলে মানুষ চিনবার ক্ষমতাও আয়ত্ব করতে হয়। কিন্তু জাপানীদের সাম্রাজ্য-বাদ হচ্ছে পুঁথিগত বিদ্যা।'

তান নিজে ঘোর জাপানী বিদ্বেষী হলেও তর্কের খাতিরে বললে—'জাপানীরা তো বন্ধুত্বের জন্য চেষ্টা করছে। তারা এশিয়ায় নববিধান প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রাচ্যের সমস্ত জাতিগুলিকে একত্র করে সাদা চামড়াওয়ালাদের তাড়াতে চায়। উপস্থিত যদিও তারা কৃতকার্য্য না হয় ভবিষ্যতে হতে পারে।'

'হ্যাঁ তা পারে। তারা এই নববিধান প্রতিষ্ঠা করতে পারে যদি না রাস্তার ওপর শিশু ও নারীকে সঙ্গীনের খোঁচা দিয়ে মেরে ফেলে,—যদি না নারীর ওপর অত্যাচার করে।'

তান্ এর উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পাছে সকলে তাকে ভুল বোঝে এই ভেবে চুপ করল। কিছুক্ষণ সবাই নীরব। অদূর আসন্ন দিনের চিন্তায় সবাই চিন্তাকুল। এমন সময় দূরে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল। পোয়া বলল—'ঐ যে আবার—সহরের পশ্চিম দিকে মনে হচ্ছে।'

আবার একটা গুলির আওয়াজ, পরক্ষণেই এরোপ্লেনের গোঁ গোঁ শব্দ। মনে হল পশ্চিমের পাহাড়টার দিকে যাচ্ছে—

যুদ্ধের সব কিছুই অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলে। এই মুহূর্তে যে কাজ করব বলে স্থির করা হয়েছে পর মুহূর্তেই তা পরিবর্তন করতে হতে পারে। গত রাত্রে মিসেস্ চাও গেরিলাদের নিয়ে পিপিঙের প্রান্তে একটা জেলখানা আক্রমণ করে কয়েদীদের মুক্ত করেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে জন বার লোক জাপানী অফিসারদের মত পোষাক পরে জেলখানার দিকে যায়। পাহারাওয়ালাদের হটিয়ে দিয়ে চাবি হস্তগত করে জেলখানায় ঢোকে। কয়েদীরা গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি হয়। গেরিলারা তাদের মুক্ত করে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে চলে যায়।

গেরিলাদের এই কাজে দুটো লাভ হয়েছে। প্রথমত গেরিলাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে, আর দ্বিতীয়ত জাপানীরা ভয় পেয়ে গিয়েছে।

আজকের এই বন্দুক-কামান গর্জন নিছক লোক দেখান ব্যাপার। গেরিলাদের কোন সন্ধানই তারা পায় নি। এরোপ্লেনটা উড়ে পাহাড়ের দিকে গিয়ে একটা মন্দিরের কাছে বোমা ফেলে এসেছে। কিছু একটা করার দরকার, এই কারণেই সাধারণ লোকের বাড়ীঘর খানাতল্লাসী সুরু হয়েছে। জনকয়েক ছাত্র এবং দেশ হিতৈষী লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গেটে যে সব লোক আসছে বা যাচ্ছে তাদের নানাভাবে হয়রাণ ও পরীক্ষা করা হচ্ছে।

এই ঘটনার চারদিন পরে একজন ক্ষুদে জাপানী অফিসার চারজন চীনা পুলিশ এবং একজন দোভাষীকে নিয়ে বেলা এগারটার সময় পোয়ার বাড়ীতে এসে হাজির। দাদু ফেঙ্ তখন ছিলেন না। বাড়ীতে ক'জন পুরুষ, কজন স্ত্রী, কার কি পেশা, কার বয়েস কত সবই লিখে নিল তারা। তারপর জাপানী অফিসারটি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করল—'বাড়ীতে আমেরিকার পতাকা উড়ছে কেন?'

পোয়া উত্তর দিল—'বাড়ীর মালিক একজন আমেরিকান মহিলা—সেই জন্যে।'

বাড়ীর মালিকের নাম কি, বয়স কত, কি করে, কোথায় থাকে কেন ভাড়া দিয়েছে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব পোয়াকে দিতে হল। বাড়ী ভাড়ার দলিলপত্রও পোয়া তাকে দেখাল। কিন্তু অফিসারটি যেন তাতেও সন্তুষ্ট নয়। পোয়া স্থানীয় আমেরিকান দূতের কথা বলে এ বিষয়ে কোন রকমে মুক্তি পেল। তারপর তারা চলল সমস্ত বাড়ীটা ভাল করে দেখতে এবং খানাতল্লাসী করতে। বাড়ীর প্রত্যেক প্রাণীকে দেখে কাগজে তার নামটি চিহ্নিত করতে লাগল। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারা মালিনের ঘরে এল। মালিন তখন শুয়ে ছিল। ঘাড়ে একটা শিরা ফুলে কষ্ট পাচ্ছিল। জাপানী অফিসারটি হঠাৎ ঘরে ঢুকে মালিনকে বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখে পোয়াকে জিজ্ঞাসা করল—'কি হয়েছে?'

মালিন ধীর ভাবে উত্তর দিল—'ঘাড়ের একটা শিরা ফুলেছে।'

পোয়াকে প্রশ্ন করল অফিসারটি—'এর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?'

'আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।'

একটু চুপ করে থেকে জাপানী অফিসারটি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করল—'কোন সম্পর্ক নেই, অথচ সে এখানে বাস করে কি রকম? তার ওপর কিছুই করে না সে।'

পোয়া উত্তর দিল—'সে আমার খুড়ীর অতিথি।' এই বলে দরজার দিকে আঙুল দিয়ে লোলাকে দেখিয়ে দিল। লোলাও ঘাড় নেড়ে সায় দিল। দোভাষীটি এই সব কথা লিখে নিচ্ছিল। কিন্তু তাদের ভাব দেখে মনে হ'ল তারা সন্তুষ্ট হয় নি। আবার জিজ্ঞাসা করল—'কোথায় জন্মেছে সে?'

মালিন এবারে ভয় পেয়ে গেল। পোয়ার ইঙ্গিতে উত্তর দিল—'সাংহাই-এ।'

'সে এখানে কেন?'

একটু বিরক্তি সহকারেই পোয়া উত্তর দিল—'সে তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'সে কোন স্কুলে পড়ত ?'

'আমি কোন স্কুলে পড়িনি।' মালিন উত্তর দিল ভয়ে ভয়ে।

'বাবার নাম কি ?'

"আমার বাবা নেই।'

'মার নাম কি ?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে মালিন একটু ইতস্তত করছিল।—মাঞ্চুরিয়ান দোভাষীটি তাই দেখে বলল—'এঁরা যা জিজ্ঞাসা করবেন তার উত্তর দিতে হবে। যা খুসী উত্তর দিতে পার কিন্তু উত্তর একটা দিতেই হবে, এই নিয়ম।'

অফিসারটি আবার জিজ্ঞাসা করল—'গত দশ বছর তুমি কোথায় বাস করেছ ?'

'সাংহাইএ এবং টিয়েনৎসিনে।'

'তোমার বিয়ে হয়েছে ?'

'না।'

দোভাষীটি যখন এই সব কথা লিখছিল অফিসারটি তখন একদৃষ্টে মালিনকে দেখছিল। পরিষ্কার বুঝা যায় যে মালিনের ওপর তার নজর পড়েছে। মালিন শঙ্কিত চাহনিতে অফিসারের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। জেরা করা হয়ে গেলে অফিসারটি দোভাষীকে বললে—'মেয়েটি দেখতে বেশ' তারপর হঠাৎ মালিনের দিকে ফিরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা চীনা ভাষায় বললে—'তুমি জাপানী হাসপাতালে যেতে পার। জাপানী ডাক্তাররা জার্ম্মান ডাক্তারদের মতই ভাল।'

মালিন চুপ করেছিল। কিন্তু অফিসারটি আবার বলল—'তুমি নিশ্চয়ই জাপানীদের পছন্দ কর। চীন জাপান তো বন্ধু।' বলেই

হাঃ হাঃ করে এক উৎকট ও কুৎসিত হাসি হেসে এগিয়ে গিয়ে মালিনের গালে একটা টোকা মারল। মালিন সভয়ে আর্তনাদ করে পেছিয়ে গেল। তার চোখমুখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে। অফিসারটি দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। আবার এদিক ওদিক ঘোরা আরম্ভ হ'ল। হঠাৎ জাপানী অফিসারটি জিজ্ঞাসা করল —'আমাদের আর কতক্ষণ লাগবে?' পোয়া উত্তর দিল—'তা প্রায় আধঘণ্টা।'

'না—আমরা এখন ফিরব।' অফিসারটির মাথায় তখন অন্য কথা ঘুরছিল। একটা ঘরে একটা ভাল জিনিষ দেখে জিনিষটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে উঠল। দোভাষীটা প্রভুর মনের ভাব বুঝতে পেরে পোয়াকে ফিস্ ফিস করে বলল—'অফিসারকে সন্তুষ্ট করাই ভাল—ঐ জিনিষটা ওঁকে উপহার দিন।'

পোয়া একটা চাকরকে ডেকে কি বললে। চাকরটি একটু পরে কি একটা জিনিষ সযত্নে মুড়ে নিয়ে এসে পোয়ার হাতে দিল। পোয়া সেটা দোভাষীর হাতে দিল। দোভাষী অফিসারকে কি একটা বলে সেটি দিল। অফিসারটি খুসী হয়ে পোয়ার করমর্দ্দন করে বলল—'বেশ সুন্দর বাড়ী আপনার।' তার পরেই চলে গেল।

দাদুফেঙ ফিরে এসে সব কিছু শুনে একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। সবচেয়ে উৎকণ্ঠা তাঁর বাড়ীর মেয়েদের জন্য। শুধু মেয়েদের নাম, বয়স নয়, তার ওপর প্রত্যেককে চোখে দেখে গিয়েছে। জাপানীদের অনেক গুণ। এর আগে বহু জায়গায় তারা জোর করে বউ ঝিকে রাত্রে নিয়ে গিয়েছে। তিনি পোয়াকে বললেন—'বাড়ীর মেয়েদের সরাতেই হবে। সময় খুব খারাপ, বিপদ সম্মুখীন...। আমার ঠাকুরদা এই বাড়ী কিনেছিলেন।—এ বাড়ী ছেড়ে আমি যেতে পারব না। তাছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য সব রসাতলে যেতে বসেছে। আমাকে

থাকতেই হবে। তোমরা সবাই এখন কোথাও চলে যাও। গোলমাল থামুক, তার পর সকলে আবার একসঙ্গে বাস করা যাবে।'

ফেঙদাদুর কাছ থেকে পোয়া মালিনের ঘরে গেল। মালিনের চোখমুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে—পোয়া ঘরে ঢোকা মাত্র মালিন বলে উঠল—'আমি আর এখানে থাকতে পারব না, আমার ভীষণ ভয় করছে।···আজ রাত্তিরটা অন্য কোথাও থাকা যায় না?'

'ভয় কিসের অত। তুমি কি ভাবছো যে তারা আজকেই তোমাকে নিয়ে যাবে। আর শীগগীরই তো আমরা চলে যাচ্ছি।'

'শীগ্‌গীর মানে কবে?'

'এই চার পাঁচ দিনের মধ্যে।'

'কেন, আজই যাওয়া যায়না?'···আমি না হয় আজ চলে যাই।'

'কি, একা? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'না, তারা আমার নাম জানতে পেরেছে।'

'তাতে ক্ষতিটা কি হ'ল?'

'পোয়া তুমি বুঝবেনা; তবে আমার আসল নাম তাদের বলা উচিৎ হয় নি। যেমন করে পার আজ রাত্রেই আমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে চল···।' একটু থেমে মালিন আবার বলল—'আমায় বরঞ্চ আজ রাত্রেই তোমার বন্ধুর বাড়ী পাঠিয়ে দাও।'

'কার বাড়ীতে, লাওপেঙের?'

'হ্যাঁ। যে কদিন তোমরা তৈরী হয়ে নিতে না পার সে কদিন আমি সেখানেই থাকব। লাওপেঙ লোক কি রকম?'

'বিপত্নীক, একাই থাকে। তোমার কোন ভাবনার কারণ নেই, অত্যন্ত ভদ্রলোক। কিন্তু তুমি কি এখন যেতে পারবে?'

'হ্যাঁ, খুব পারব।'

'তোমার জিনিষপত্র গুছোতে হবে।'

'সে একমিনিটেই আমি ঠিক করে নেব।'

'আচ্ছা—তা হলে তাই হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কর—অন্ধকার হলে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

* * *

'আমার আসল নাম তাদের বলা তোমার উচিত হয় নি'—কথাটি পোয়ার মাথায় অনবরতই পাক খাচ্ছিল। কতটুকুই বা সে জানে মালিনের সম্বন্ধে। সেদিন যেটুকু শুনেছে, সে তো সামান্য মাত্র। তার নামের এমন কি রহস্য থাকতে পারে? বিকেলে পোয়া মালিনের কাছে গেল। তার ঔৎসুক্য যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। মালিনকে বলল—'তুমি ও কথাটা কেন বললে—তোমার নামের এমন কি রহস্য আছে?'

'সে অনেক কাহিনী।'

'তা হোক্। আমি তোমার অতীত জীবনের কথা শুনবই।'

'কোন্ সময়কার কথা বলব বল।'

'একেবারে ছেলেবেলা থেকে।'

'এখন থাক্। পথে অনেক সময় পাওয়া যাবে, তখন বলব।'

'না এখনই বলতে হবে।'

অগত্যা মালিন তার পূর্ব জীবনকথা পোয়াকে শুনাল।

—মালিনের মা সাংহাইএর কাছে বাচাত জেলার মেয়ে। মা যখন তার বাবার কাছ থেকে চলে যায় তখন মালিনের বয়স বার বছর। মালিনের মা শিশুকন্যাকে সঙ্গে করে সাংহাইএ এসে একটা স্কুলে মাষ্টারী নেয়। প্রথম প্রথম মালিনকে সঙ্গে করেই স্কুলে নিয়ে যেত তার মা। কিন্তু কিছুদিন বাদে এক হাইস্কুলে মাষ্টারী পাওয়ার পর থেকে আর তাকে স্কুলে নিয়ে যেত না—বাড়ীতেই রেখে যেত। একা একা বাড়ীতে থাকতে হত, আর সংসারের যাবতীয় কাজ একাই

করতে হত বলে মালিন বেশ গোছাল হয়ে উঠল। একটু বড় হতেই সংসারের যাবতীয় কাজই সে করে রাখত, তার মাকে কিছুই করতে দিত না। মায়ের সারাদিনকার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি! তার মা রাত্রে তাকে লেখাপড়া শেখাত। স্কুলের পরীক্ষার যে সব খাতা তার মা বাড়ীতে নিয়ে আসত দেখবার জন্য সেগুলি দেখে দেখে মালিন আরও অনেক কিছু শিখে ফেলল। শেষের দিকে তার মার খাতা তো সেই দেখত। এদিকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটতে খাটতে তার মার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল। হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে তার মা মারা গেল। তার মার বয়স বেশী হয় নি। মাত্র চল্লিশ। মালিনের বয়স তখন সতের। এই সব কথা বলতে বলতে মালিন হঠাৎ পোয়াকে বলে উঠল—'দেখ পোয়া, মানুষ মরলেও ধনী দরিদ্রের পার্থক্য ঘোচে না। কেউ মরলে আত্মীয় স্বজনের কাছে তার শোকের চেয়ে বড হয়ে দেখা দেয় তার শেষকৃত্য করা। সেই শেষকৃত্যটুকু সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে না পারায় গরীবদের দুঃখের আর অন্ত থাকে না।'

—পাড়া, পড়শী, বন্ধু বান্ধব ও স্কুল থেকে যে সাহায্য পেল তাতে তার মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে ও ঘর ভাড়া দিয়ে মাত্র আর পঞ্চাশ ডলার তার হাতে থাকল। মা যে স্কুলে চাকরী করত সেই স্কুলে সে চাকরীর দরখাস্ত করল, কিন্তু স্কুল কলেজের কোন খেতাব না থাকায় স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ তাকে চাকুরী দিলেন না। কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে বহু জায়গায় চাকরীর দরখাস্ত করেছিল সে, কিন্তু সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা। গৃহ শিক্ষয়িত্রীর চাকরীর চেষ্টাও করল। সে পাওয়া আরও কঠিন। বহু চেষ্টার পর শেষে একজায়গায় গৃহশিক্ষয়িত্রীর চাকরী পেল। ছাত্রের মা প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহারই করত। কিন্তু তিন সপ্তাহ পরে তার চাকরী গেল। তার অপরাধ সে দেখতে ভাল। ছাত্রের বাবার সঙ্গে তার মার মন কষাকষি আরম্ভ হয় তাকে কেন্দ্র করে এবং ফলে তার

চাকরী যায়। বিপন্ন হয়ে সে রাস্তায় রাস্তায় চাকরীর জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেও এক দোকানে সেলসগার্লের কাজ নিল। মালিক একজন ধনী ব্যক্তি। কাজকর্ম কিছুই ছিল না—সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে একঘরে বসে শুধু গল্প করা। সেখানে চাকরী করতে করতে একটা সুযোগ জুটে যায়। স্থানীয় এক মেয়েদের পত্রিকায় একটা ছোট গল্প লিখে পাঠিয়েছিল সে। একদিন দেখে সেই পত্রিকার সম্পাদিকা তাকে চিঠি লিখেছে সেই গল্পের পারিশ্রমিক স্বরূপ পঞ্চাশ সেণ্ট পত্রিকা অফিস থেকে নিয়ে আসতে। কিন্তু মুশ্‌কিল হল যে সেখানে যেতে হলে যে গাড়ী ভাড়া লাগবে তাতে ঐ পঞ্চাশ সেণ্ট খরচ হয়ে যাবে। সুতরাং মালিন আরও গল্প লিখে পাঠাতে লাগল। মাসের শেষে পেল তিন ডলার পঞ্চাশ সেণ্টের এক চেক। কি আনন্দ সে দিন। টাকাটা হাতে পাওয়ার পরই সে গেল থিয়েটার দেখতে। হঠাৎ একবার উচ্ছ্বাসের মাথায় চিৎকার করতেই সামনের এক অল্পবয়সী ভদ্রলোক তার দিকে ফিরে তাকাল। পরেও মালিন লক্ষ্য করল যে ভদ্রলোকটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। থিয়েটার হয়ে গেল। ফিরবার সময়ও সে দেখল যে ভদ্রলোকটি তার পিছনে আসছে। একরকম বেহায়ার মতই ভদ্রলোকটি গায়ে পড়ে তার সঙ্গে কথা বলল। তাকে গাড়ী করে পৌঁছে দিতে চাইল। মালিনের প্রথমটা একটু শঙ্কা ও সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু তার বয়স তখন কাঁচা—রোমান্সের নেশা পেয়ে বসল তাকে। মালিন তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। তারপর প্রায়ই উভয়ে একসঙ্গে থিয়েটার দেখত। একদিন ছেলেটি থিয়েটার ফেরৎ মালিনের বাসায় গিয়ে হাজির। সে রকম জায়গায় মানুষ কি করে থাকতে পারে! ছেলেটি মালিনের অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করল। প্রায় দৈনিকই তার কাছে আসত সে। কিছুদিন পরে তার সঙ্গে মালিনের বিয়ে হ'ল। বিয়ের ব্যাপারটা প্রথমত গোপনই

ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটির বাবা জেনে ফেলল। এর পরের কথা তো আর একদিন বলেছি।'

'হ্যাঁ বলেছ, কিন্তু সেখান থেকে চলে আসার পর তোমার কি হল বা তুমি কি করলে তা তো বল নি?'

এমন সময় লোলা ঘরে ঢুকতে প্রসঙ্গটা চাপা পড়ল।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পোয়া মালিনকে নিয়ে লাওপেঙের বাড়ী চলল। স্যুটকেস ও বিছানা দিয়ে একটি চাকরকে আগেই পাঠিয়েছিল। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন। উভয়ে একেবারে মসগুল। কথা বলতে বলতে পোয়া এত বিভোর হয়ে পড়েছিল যে কোন্ রাস্তা দিয়ে চলেছে বা কতদূর এসেছে কিছুই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সেই পরিচিত পুলিসটিকে দেখে তার খেয়াল হল যে এই সদর রাস্তা দিয়ে যাওয়া উচিত হবে না তাদের। পাশের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকল দুজনে। সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলি—জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। লাওপেঙের বাড়ীর দরজায় তার সেই চাকরটি অপেক্ষা করছিল। পোয়া তাকে বাড়ী চলে যেতে বলল। লাওপেঙ ঘরেই ছিল। অত্যন্ত চিন্তামগ্ন। পোয়া ও মালিনকে দেখে সচকিত হয়ে উঠে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল সে।

'ইনিই মিস স্যুই।' পোয়া লাওপেঙের সঙ্গে মালিনের পরিচয় করিয়ে দিল। মালিন নমস্কার করে বলল—'পোয়া শাওয়ে আপনার কথা প্রায়ই বলেন। এভাবে যে আপনাকে কষ্ট দেব তা আমি নিজেও কোনদিন ভাবতে পারি নি।'

লাওপেঙ বিনীতভাবে বলল—'আপনার শোবার অসুবিধা হবে। আপনি আজ রাত্রের মত এই বিছানাটায় শোবেন।' এই বলে নিজের বিছানাটা দেখিয়ে দিল। পোয়া হেঁসে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কোথায় শোবে?' লাওপেঙ উত্তর দিল—'আমার সম্বন্ধে তোমাকে ভাবতে

হবে না। আমি যেখানে সেখানে শুতে পারি। এই আর্ম চেয়ারটির ওপরেই আমি আজ রাতটা কাটিয়ে দেব।'

খাটখানা আর আধময়লা বিছানাটার দিকে তাকিয়ে মালিন বলল—'আমার শোবার প্রয়োজন হবে না।'

'না, না, শুধু আজ রাত্তিরের মত। আর একটা ঘর আছে সেটা অপরিষ্কার—কাল ঠিক করে দেব।'

মালিন হেসে বলল—'আপনাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না। একটা রাত্তির, দুজনের কোন রকমে এখানেই চলে যাবে।'

এই মধ্যবয়স্ক লোকটিকে মালিনের বেশ ভালই লাগল। তাকে দেখলে সত্যিই মনে হয় যে সে একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি। নীচু স্বরে আস্তে আস্তে কথা বলবার ভঙ্গীটি বেশ সুন্দর। প্রশস্ত কপালের কুঞ্চনরেখায় আর অবিন্যস্ত কটা কটা চুলগুলিতে তাকে বেশ মানিয়েছে। সব চেয়ে ভাল লাগে তার হাসিটুকু। সারাক্ষণই হাসি লেগে আছে মুখে—একেবারে ছেলেমানুষের হাসি। এই বয়সের লোকের মুখে ঐ জাতীয় হাসি সচরাচর দেখা যায় না। এর মধ্যেই মালিন মনে মনে লাওপেঙের বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। নানা কথাবার্ত্তায় তাদের সবারকার মধ্যেরই সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে পোয়া মালিনের চুলগুলি লক্ষ্য করে বলল—'আজ চুলগুলি ভাল করে আঁচড়াও নি কেন? ক্লিপ দিয়ে আটকাও নিই বা কেন?' মালিন আয়না খোঁজ করতে—লাওপেঙ ঘরের কোনে ছোট্ট একখানা অপরিষ্কার আয়না দেখিয়ে দিল। মনঃপুত না হওয়ায় অগত্যা মালিন তার হাত ব্যাগ থেকে নিজের ছোট আয়নাখানা বের করল। মালিন যখন আয়নার সামনে চুল ঠিক করছিল তখন পোয়া বলল—'পেঙ, তুমিই বল মালিন সত্যিই সুন্দরী কিনা?' আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে মালিন আড়চোখে পোয়ার দিকে চেয়ে হাসল।

'মালিনের কানের পাশে যে লাল জড়ুল চিহ্নটা আছে তা আমার আরও ভাল লাগে।'

'কই, দেখি' বলে লাওপেঙ সেটাকে ভাল করে দেখবার জন্য যেই মালিনের কানের পাশে হাত দিয়েছে, অমনি সুড়সুড়ি লাগার জন্যে মালিন হেসে উঠল। লাওপেঙ বেশ একটু গম্ভীর চালে বলল—'হুঁ বুঝেছি! তোমরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছ।' পোয়া ও মালিন পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসে উঠল। মালিন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

সকালবেলাকার থানাতল্লাসীর ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বলল পোয়া। নিজের অভিপ্রায়ও জানাল সে। সব শুনে লাওপেঙ জিজ্ঞাসা করল—'এরপর তোমরা কি করবে স্থির করেছ?'

'সঠিক কিছুই স্থির করি নি, তবে এইটুকু স্থির করেছি যে আমরা দুজনে এক সঙ্গে যাব।'

'তোমার স্ত্রী?'

'তার ব্যবস্থাও আমি করে যাব।'

'সে যদি রাজি না হয়?'

'তা হবে। যেখানে খুসী সে থাকতে পারে। আমার বিষয় সম্পত্তি সব সে ভোগ করতে পারে। আমি মালিনের সঙ্গে, আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে যাযাবরের জীবনযাপন করতেও প্রস্তুত আছি।'

'অর্থাৎ কাইনানের সঙ্গে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ না হয় তা হলে পোয়ার রক্ষিতা হিসাবে বাস করতে আপনি রাজি আছেন?' সোজা এই কথা মালিনকে জিজ্ঞাসা করল লাওপেঙ।

মালিন লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে পড়লো। একটু ঢোক গিলে বলল—'আমি অত শত বুঝি না। আমি তার সঙ্গে থাকতে চাই, এই মাত্র বুঝি।'

পোয়া বাড়ী যাবার জন্য উঠল। লাওপেঙ পোয়াকে জিজ্ঞাসা করল—'আজকাল বেশ ঠাণ্ডা, মালিন তার কাপড়-চোপড় এনেছে ত?'

পোয়া উত্তর দিল—'মোটামুটি এনেছে, বাকী কাল সকালে আমি নিয়ে আসব।'

দরজা পর্যন্ত মালিন পোয়ার সঙ্গে গেল। পোয়ার হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে সে বলল—'আবার কাল দেখা হবে।'

॥ ৬ ॥

লাওপেঙের সঙ্গে মালিনের এই আলাপে সত্যিই অভাবনীয়। নিতান্ত ঘটনাচক্রে এই আলাপ ঘটেছে। লাওপেঙের বয়স বেশী, সেদিক থেকে সঙ্গী হিসাবে মালিনের একটু অসুবিধা হতে পারত। লাওপেঙের পঁয়তাল্লিশ আর মালিনের পঁচিশ। প্রথম বয়সে লাওপেঙের যদি মেয়ে হত তা হলে সে আজ মালিনের সমবয়সী হত। তবু মালিন কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিল না—কারণ লাওপেঙ একটু ভিন্ন ধরণের মানুষ। যে যে গুণ থাকলে মানুষের সম্পূর্ণতা আসে, লাওপেঙের—তার কোন অভাব ছিল না। কিছুদিন বাদে মালিন জানতে পেরেছিল যে লাওপেঙ 'চীনা বৌদ্ধ', কিন্তু গোঁড়ামী বলতে কিছুই তার ছিল না, এমন কি মাংস পর্যন্ত খেত। তার জীবনযাত্রা প্রণালী দেখলে বেশ বুঝা যায় যে সে একজন উঁচুস্তরের মানুষ। লাওপেঙকে মালিনের আরও যোগ্যতর ব্যক্তি বলেই মনে হ'ল। পোয়ার কাছে নিজেকে ছোট লাগত মালিনের, কিন্তু পেঙের কাছে সে রকম কোন ভাব আসত না। মানুষের সত্যকার মহত্বের পরিচয়ই বোধ হয় এইখানে।

নতুন পরিবেশের মধ্যে মালিনের ঘুম আসছিল না, কিন্তু ক্যাঁচকেঁচে আর্ম-চেয়ারটায় শুয়ে লাওপেঙ···দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিল। শেষ রাত্রের দিকে মালিন ঘুমিয়ে পড়ল। উঠতে তার বেলা ন'টা হয়ে

গেল। ইতিমধ্যে ভোরে উঠে প্রাতরাশ সেরে লাওপেঙ বেরিয়ে গেল—বাইরের আবহাওয়া ও পরিবেশটা বুঝতে। ফিরবার সময় মালিনের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এল। মালিন তখন জেগেছে। গলা খ্যাকারি দিয়ে পেঙ ঘরে ঢুকল।

'ওঃ বড্ড বেলা হয়ে গিয়েছে। কটা বেজেছে?' বলে মালিন উঠে বসল।

'প্রায় ন'টা। আপনার ঘুমের কোন অসুবিধা হয় নি ত? বেশ হাতমুখ ধুয়ে প্রাতরাশটা সেরে নিন।'

চাকরটি মুখ ধোবার জল ঠিক করেই রেখে গিয়েছিল। মালিন চোখ মুখ ধুয়ে প্রাতরাশ সেরে নিল। লাওপেঙ বলল—'বাইরের আবহাওয়া বিশেষ ভাল বলে মনে হ'ল না। হটেমান ষ্ট্রীটে বহু জাপানী সৈন্য দেখলাম। কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।'

এমন সময় চাকরটি এসে লাওপেঙকে খবর দিল—কে একজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'কি ধরণের লোক?'

'নীল রঙের পোষাক পরণে আছে তার। কি কথা আছে, আপনাকেই বলবে।'

লাওপেঙ বাইরে বেরিয়ে গেল। মিসেস্ চাও-এর বাড়ীর চাকর—লাওপেঙের পরিচিত। সে খবর নিয়ে এসেছিল যে জাপানীরা সহরের পশ্চিমাঞ্চলে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। মিসেস চাও আত্মগোপন করে আছেন। তিনিই বলে পাঠিয়েছেন—লাওপেঙ যেন বাড়ী ছেড়ে চলে যায়—নতুবা বিপদ ঘটতে পারে। সহরের বিশেষ কোন গেট দিয়ে গেলে এবং গোপন ইঙ্গিত বা চিহ্ন দেখালে সহজেই সহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। সেখানকার প্রহরীরা মিসেস্ চাওএর পরিচিত লোক। এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করা উচিত নয়। এই খবর দিয়েই লোকটি

চলে গেল। লাওপেঙ গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকল। তাঁর চোখে মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

মালিন জিজ্ঞাসা করল—'কে? পোয়ার কাছ থেকে এসেছিল কেউ?'

'না, আপনি তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিন।...অত্যন্ত জরুরী সংবাদ। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। গেরিলাদের জন্য জাপানীরা সারা সহর তল্লাসী করছে, ভীষণভাবে ধরপাকড হচ্ছে। এ বাড়ীতে যে কোন মুহূর্তে তারা আসতে পারে। আমি এখনই সহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনারও এখানে থাকা চলবে না—আপনি বরঞ্চ পোয়ার ওখানে চলে যান।'

'সেখানে আমার যাওয়া চলবে না।'

'এ জায়গার চেয়ে সেটা ত নিরাপদ। সেখানে তো আপনি এতদিন ছিলেন। তাছাড়া আপনি তো তার সঙ্গে সাংহাই যেতে চান।'

'তা চাই, কিন্তু আরও চার পাঁচ দিন পরে সে রওনা হবে। এ কদিন আমি সেখানে থাকতে পারি না। জাপানীরা আবার হানা দিতে পারে। আপনি কোন্ দিকে যাবেন?'

লাওপেঙ তার দিকে চেয়ে বলল—'আমি দক্ষিণ দিকেই যাব।'

'কাকাবাবু, আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। আমরা বরঞ্চ পোয়ার সঙ্গে সাংহাইএ দেখা করব। আপনিও তো সাংহাই-এ যাবেন?' এই প্রথম মালিন পেঙকে কাকাবাবু বলে সম্বোধন করল।

লাওপেঙ একটু আশ্চর্য হয়ে মালিনের দিকে তাকাল।

'তা সঠিক বলতে পারি না। মিস্ সুই, রাস্তা খুবই বিপদ সঙ্কুল ও কষ্টসাধ্য। তারপর হাটাপথে যেতে হবে।'

'তা হোক্। আমি সে সব কষ্ট সহ্য করতে পারব।'

'বেশ, তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নাও। পোয়ার সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে না ?'

'না—সেখানে যেতে আমার সাহস হয় না।'

'তা হলে তাকে একটা চিঠি লিখে দাও।'

'আমি এখন লিখতে পারব না…।'

'তবে চাকর পাঠিয়ে খবর দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে টাকাপয়সা কিছু আছে ?'

'পাঁচশ ডলার আছে।'

'যথেষ্ট। অন্যান্য দরকারী জিনিষপত্র রাস্তায় কিনে নিলেই হবে।'

লাওপেঙ চাকরটিকে ডেকে তার হাতে একশ ডলার দিয়ে বলল, —'আমরা বাইরে চলে যাচ্ছি। কবে ফিরব জানি না। যদি কেউ খোঁজ করে তো ব'লো যে আমি সহরের বাইরে গিয়েছি। আর পোয়ার বাড়ীতে গিয়ে তাকে খবরটা দাও যে আমরা সহরের বাইরে চলে গেলাম। সাংহাইএ তার সঙ্গে দেখা করব। কাউকে বেশী কিছু বলবে না। এখন গিয়ে দুটো রিক্সা ডেকে নিয়ে এস।'

মালিন খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সে চাকরটিকে বলল,—'অবশ্য অবশ্য পোয়াকে বোলো যে আমরা সাংহাইএ তার সঙ্গে দেখা করব।' লাওপেঙ তার সঙ্গে বলল—'পোয়াকে বলো যে মিস্ সুইএর জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি তার সম্বন্ধে যথাসাধ্য যত্ন নেব ও সাবধান থাকব।'

মালিন তার সুটকেসটা ও লাওপেঙ তার ব্যাগটা নিয়ে রিক্সায় উঠল। সহরের উত্তর পশ্চিম নানাদিক ঘুরে নানা গলির মধ্য দিয়ে বার তিনেক রিক্সা বদল করে তারা সিপিয়েনমেন গেটের প্রায় গজ পঞ্চাশ দূরে রিক্সা হতে নামল।

পিপিংএর এই গেটটি একটু অন্য রকমের। বাইরের দিকের প্রথম গেটটির পরই একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার দেওয়াল, তার পরেই আবার আর একটা গেট এবং তার পিছনেও ঐ রকমের আর একটা দেওয়াল। আগের দিনে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য বোধহয় এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এদিক ওদিক একবার ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে লাওপেঙ গেটের দিকে এগিয়ে গেল। একজন পাহারাদার জিজ্ঞাসা করল—'কোথায় যাবেন ?'

'সহরের বাইরে একটা গ্রামে—পদব্রজেই যাব।' এই পদব্রজে কথাটাই হচ্ছে গেরিলাদের সাঙ্কেতিক ছাড়পত্র।

'এখন যাবেন না। রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বাইরের গেটে জনকয়েক জাপানী পুলিশ আছে।'

'তাকে ধন্যবাদ দিয়ে লাওপেঙ ফিরে এল। তার রিক্সাওয়ালাটা অল্প বয়সী। সে হেসে জিজ্ঞাসা করল—'কি, যাওয়া যাবে না ?'

লাওপেঙ উত্তর দিল—'না, এখন আর যাব না, কিছু কেনাকাটাও করতে হবে।'

গেটের কাছাকাছি অঞ্চলটিতে—রাস্তার চায়ের দোকানে, খাবার দোকানে নানাজায়গায় বহুলোকের ভীড়—জটলা করছে, খোস গল্প করছে। লাওপেঙের বুঝতে দেরী হল না যে এরা গেরিলাদের সমর্থকের দল। এখানে ভিড় করার কারণই হচ্ছে তাদের গতিবিধিতে সাহায্য করা। লাওপেঙ মালিনকে নিয়ে কাছাকাছি একটা রেস্তোরায় দিনের বেলাটা থাকবার জন্য একটা ঘর ভাড়া নিল। কিছু খাওয়া দাওয়া করে মালিনকে ঘরে থাকতে বলে লাওপেঙ বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে মালিনের জন্য কিছু গরম পোষাক কিনে নিয়ে ফিরে এল। যে সব গরম পোষাক কম্বল কিনে নিয়ে ফিরল তার মধ্যে

কতকগুলি পুরুষের পোষাকও ছিল। মালিন জিজ্ঞাসা করল—'এগুলি কিনলেন কেন?'

'এগুলি তোমার জন্যই কিনলাম। অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক এগুলি। পাহাড়ের শীত প্রচণ্ড। ভালকথা, তুমি এবার পোয়াকে একখান চিঠি লেখ।'

'কি লিখব?'

'সে আমি কি করে বলব। যা ভাল লাগে লেখ।'

মালিন পোয়াকে লিখল —

পরম পূজনীয় অগ্রজ প্রতিমেষু—

হঠাৎ এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল যে বিদায় লইবার সময় পর্যন্ত পাইলাম না। অন্য কোন উপায় ছিল না। আপনি যেন ভুল বুঝিবেন না। রাস্তায় অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়া আমায় যাইতে হইবে। কিন্তু এই পথের কষ্ট আমার কাছে কিছুই না—আবার যে সাংহাই-এ আপনার সঙ্গে মিলিত হইব। আপনার বাড়ীতে যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা আমি পাইয়াছি। লোলা ও অন্যান্য সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাইবেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় লাওপেঙের মত লোক সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার মত মহৎ ব্যক্তি আমি জীবনে খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি আমাকে অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ের মত দেখেন। অধিক আর কি লিখিব। মনের সকল কথা চিঠিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আবার সাক্ষাৎকারে সকল কথা বলিব—

ইতি—আপনার স্নেহের বোন লায়েনারা।

মালিন চিঠিখানা লাওপেঙকে দেখাল। হাতের লেখাটা সত্যিই ভাল—পেঙ একটু অবাকই হয়েছিল। অবশ্য ভাষাটা একটু সেকেলে ধরণের। সন্ধ্যা হয়ে এল। এবার বেরুতে হবে। বোঝাটাও একটু বড় হয়েছে কতকগুলি সওদাপত্রে। পেঙ একবার গেটে গিয়ে খোঁজ

নিয়ে এল জাপানী সৈন্য ক'জন আছে না চলে গিয়েছে। না তারা চলে গিয়েছে। বেরুবার সময় লাওপেঙ মালিনকে বলল—'যদি কেউ রাস্তায় জিজ্ঞাসা করে তুমি আমার কে হও, তা হলে বোলো ভাইঝি।'

রিক্সায় জিনিষপত্র নিয়ে তারা রাত্রি আটটার সময় গেটের কাছে এসে পৌছাল। অর্ধচন্দ্রাকার দেওয়াল পার হয়ে তারা বাইরের গেটের কাছে এল। এখানে জন ছয়েক পাহারাদার ছিল, তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—'আপনারা এসময় কোথায় যাবেন?'

'আমরা বাইরে, কাছেই একটা গ্রামে যাব—পদব্রজে।'

পাহারাদারটি লাওপেঙের মুখের ওপর টর্চ ফেললো—রিক্সার ওপর মালিন ও জিনিষপত্র দেখে জিজ্ঞাসা করল—'আপনি কি আজ সকালেও এসেছিলেন?'

কি উত্তর দেবে লাওপেঙ! ভেবে কিছু স্থির করতে না পেরে বলল —'আমরা পদব্রজে যাব বলে এই অল্প জিনিষপত্র নিয়ে এসেছি, আপনি খানাতল্লাসী করে দেখতে পারেন। আমরা পথচারী—পদব্রজে যাব…।'

পাহারাদারটি আর একবার টর্চের আলোয় লাওপেঙের মুখখানা দেখে নিয়ে বলল—'একটু অপেক্ষা করুন।' এই বলে সে চলে গেল। প্রায় পাঁচমিনিট পরে একটা ঝুড়ি হাতে করে এনে লাওপেঙের রিক্সার ওপর রাখল। লাওপেঙ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সে বলল—'কিছু তরিতরকারী ও চাল আছে, আপনার বন্ধুবান্ধবদের জন্য নিয়ে যান। সম্মুখে কোন জাপানী সৈন্য নেই।'

লাওপেঙ তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। গেটের ভেতর দিয়ে রিক্সা চলতে লাগল। ঝুড়িটা উপর থেকে দেখলে মনে হয় সত্যই তরকারীর ঝুড়ি। কি আছে দেখবার জন্য ঝুড়িটা কোলে তুলে নিতে গিয়ে দেখল যে ওজন প্রায় মণখানেক। রিক্সাটা একটু পেছন দিকে টাল

খেয়ে গেল। ভালকরে চেষ্টা করে বুঝল যে বন্দুকের গুলি ভর্ত্তি। হয়ত কোন গেরিলা বন্ধু এটা ফেলে গিয়েছে কিম্বা দিনের বেলায় নিয়ে যেতে পারেনি বলে রেখে গিয়েছে এবং কেউ তার যাবার সংবাদ আগেই পাহারাওয়ালাদের জানিয়ে গিয়েছে।

মালিন জিজ্ঞাসা করল—'ঝুড়িতে কি আছে?'

'কিছু চাল ও তরিতরকারী আছে। পাহারাওয়ালা আমায় চেনে বলে এগুলি আমার হাতে পাঠাল।' এর বেশী কিছু বলা যায় না। রিক্সাওয়ালা শুনলে আবার কিছু বলতে পারে। গেট পেরিয়েই রাস্তাটা বড় অসমতল আর অত্যন্ত অন্ধকার। রিক্সার নীচে তেলের কুপি ছুটো টিম্ টিম্ করছে, আর রিক্সাওয়ালার পায়ের ছায়া ভূতের মত লম্বা হয়ে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। পাহাড়ের উপরে আকাশের সীমারেখাটা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। আকাশে ছ'চারটে তারা আছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে গ্রামের ছ'একটা আলো দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বইছিল। মালিন বাইরে কোন দিন থাকে নি, বরাবরই সহরে বাস করেছে। এ সমস্ত দেখে তার খুব ভাল লাগছিল। প্রায় চেচিয়েই সে বলে উঠল—'কি সুন্দর, কি চমৎকার!'

লাওপেঙের রিক্সা তার পিছু পিছুই চলছিল। সে বলল—'কি চমৎকার?'

'গ্রাম……জমি, পাহাড়, আকাশের নক্ষত্র…তার সঙ্গে এই মিঠে হাওয়া……।'

এসবের পরিবর্তে লাওপেঙের মনে তখন গ্রামের ছুঃখ ছুর্দ্দশা মহামারী, অন্নকষ্টের চিন্তা। তাই উত্তরে শুধু বলল—'আমি ভেবেছিলাম হয়ত এসব তোমার ভাল লাগবেনা। তোমরা সহর-ঘেঁষা বড়লোক।'

একটু আহত হয়েই মালিন উত্তর দিল—'আমি বড়লোক নই।'

লাওপেঙ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—'পোয়া আমায় বলেছিল তুমি বিবাহিত।'

'হ্যাঁ, একরকম বিবাহিতই বলা যায়, তবে আমি তাকে ছেড়ে চলে এসেছিলাম।'

'আইনত বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল?'

'না…আমি পালিয়ে এসেছিলাম তার কাছ থেকে। পরে একদিন সব বলব।'

রিক্সায় চলতে চলতে কথাবলার অসুবিধা হচ্ছিল। তার ওপর মালিনকে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলতে হচ্ছিল। তা ছাড়া সব কথাই রিকশাওয়ালারা শুনছে। কাজেই উভয়ে চুপচাপ চলতে লাগল।

হঠাৎ দূরে যেন কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। লাওপেঙ একটু চিন্তিত হয়ে উঠল। সঙ্গে গুলির ঝুড়ি। যাই হোক, মালিনকে পরামর্শ দিল স্বাভাবিক ভাব থাকতে, যেন কোনমতেই কোন ভয়ের ভাব প্রকাশ না পায়। পায়ের শব্দ যেন খুব কাছে এগিয়ে আসছে। আর মাত্র গজ দশেক দূরে। তাদের মধ্যে দুজন রিভলবার উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কারা, কোথায় যাচ্ছেন?'

লাওপেঙ রিক্সা থেকে নেমে বলল—'আমরা এই সহরেই থাকি—পার্বত্য অঞ্চলে এক গ্রামে যাব।'

'ছাড়পত্র আছে?'

'হ্যাঁ, আমরা পদব্রজে যাব।'

এই পদব্রজে শুনে তারা রিভলবার নামাল। সকলে প্রায় সমস্বরে বলে উঠল—'আমাদেরই বন্ধু।' তাদের মধ্যে একজন বিদেশী ভদ্রলোক ছিলেন। তাকে দেখিয়ে লাওপেঙ জিজ্ঞাসা করল—

'এই বিদেশী ভদ্রলোক কে?'

'ইনি একজন ইতালীয়। আমরা এঁকে এই সহরে নিয়ে যাচ্ছি।'

'নিকটের গ্রামটি আর কতদূর ?'

'এই এক লি হবে।'

লাওপেঙ তাদের দলপতিকে রিক্সার কাছে ডেকে নিয়ে ঝুড়িটা তুলতে বলল। সে এতেই বুঝল ঝুড়িতে কি আছে।

লাওপেঙ বলল—'আজ রাতটা এখানে গ্রামের মোড়লের বাড়ীতে থাকতে হবে। ঝুড়িটা আমার পক্ষে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আপনার লোকেরা ফিরবার পথে এটা নিয়ে যেতে পারবে না ?'

'হ্যাঁ পারবে। আর আমরাও রাত্রে সেই খানেই থাকব।'

সহরের দিকে চলে গেল তারা। আরও খানিকটা এগুনোর পর লাওপেঙ গ্রামে এসে পৌঁছাল। এক পরিচিত দরজার সম্মুখে নেমে দরজায় ঘা দিতেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। তিনিই এই গ্রামের মোড়ল। লাওপেঙ এবং মালিনকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তিনি। বললেন যে তিনি এতক্ষণ তাদেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রিক্সাওয়ালারা ফিরে গেল। পেঙ ও মালিন ভেতরে ঢুকল। ঘরে আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। জাপানীরা সব নিয়ে গিয়েছে এবং নষ্ট করে দিয়েছে। একটা কেরসিনের বাতি টিম্ টিম্ করছে। একপাশে একখানা খাটিয়ার ওপর ময়লা মাদুর ও খান কয়েক লেপ পড়ে আছে।

'আপনাদের এখানেই শুতে হবে। বিছানাটা মোটেই ভাল নয়। অসুবিধা হবে একটু, তবে পাশে আগুন আছে এবং লেপও আছে। শীতে কষ্ট হবে না।'

বৃদ্ধ গৃহস্বামীর বয়স প্রায় ষাট্। অতিথিদের চা দিয়ে আপ্যায়িত করলেন তিনি।

'এটি কি আপনার মেয়ে ?'

'না—ভাইঝি। এখানে কোন ঝামেলা নেইতো ?'

'না—'জাপানীরা দূরে দক্ষিণদিকে চলে গিয়েছে, তা ছাড়া আমরাও একটু তৈরী হয়েছি। আমাদের গ্রামের লোকেরা প্রায় সকলেই ফিরে এসেছে। তবে আমার দুই ছেলে এখনও পাহাড়েই আছে।'

অনেক রাত্রি হয়ে গিয়েছে—সকলের শুয়ে পড়া দরকার। বিছানার এক পাশে মালিন শুয়ে পড়ল। মধ্যে পেঙ এবং অপর পাশে গৃহস্বামী শুলো। শুয়ে শুয়ে পেঙ ও মোড়ল গল্প করতে লাগল।

মালিন গত চব্বিশ ঘণ্টার অভিজ্ঞতা—এই নতুন পরিবেশ আর পোয়ার কথা চিন্তা করছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মালিন ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাত্রে যখন গেরিলা সৈন্যরা ফিরে এল, মালিন তখন ঘুমাচ্ছে। কিছুই জানতে পারল না।

॥ ৭ ॥

খুব ভোরেই মালিনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। লাওপেঙ তাকে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে বলল। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। গেরিলারা পাহাড়ের দিকে যাবে, তাদের সঙ্গে যাওয়াটাই যুক্তি-সঙ্গত। তাছাড়া মালপত্রগুলি নিয়ে যাবার দুর্ভাবনা হতে রেহাই পাওয়া যাবে। লাওপেঙের কথামত মালিন নিতান্ত সাধারণ পোষাক-আষাক পরল। জলযোগ করেই তারা বেরিয়ে পড়ল। বহু ঘোরা ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তারা বড় একটা পুরাণ মন্দিরে এসে পৌছাল। এই মন্দিরটি হচ্ছে গেরিলাদের এই অঞ্চলের সমর অফিস। সেখানে অনেক লোক। একটা ঘরে ক্লাস হচ্ছে। একটী মোটা অল্পবয়সী মেয়ে তাদেরকে কি সব শেখাচ্ছে। লাওপেঙ ও মালিনকে তারা মন্দিরের ভিতরের দিকের একটা ঘরে নিয়ে গেল। একজন বছর ত্রিশেক বয়সের লম্বা যুবক তাদের অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর নাম মিষ্টার মাও।

'কমরেড পেঙ, আপনি আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছেন। এখন আপনার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা কি স্থির করলেন? শত্রুরা দুটো রেললাইন ধরে প্রবেশ করছে সর্পিল গতিতে। তাদেরকে গ্রাস করতে হবে। তারা যেখানেই যাক না কেন, আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করতে হবে। যদি তারা কোন সহরে ঢোকে, তা হলে উপকণ্ঠস্থ গ্রামগুলিতে আমাদের আস্তানা গাড়তে হবে, সেখানকার গ্রামবাসীদের তৈরী করতে হবে, আমাদের দলে ভেড়াতে হবে। এই উপায়টা সহজ বলে আমার মনে হয়।' তারপর মালিনের দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— 'আপনি সাংহাই-এ যেতে চান কেন? আমার তো মনে হয় এই রকম বাইরের জীবন আরও ভাল।'

'আমাকে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কিন্তু আমরা কি ভাবে যাব?'

মিষ্টার মাও হেসে উত্তর দিলেন—'কেন হেঁটে। আর নিতান্তই যদি আপনার কপাল ভাল হয় এবং জাপানীদের কাছ থেকে কোন ঘোড়া ছিনিয়ে নেওয়া যায়, তা হলে আপনার সুবিধার জন্য দিতে পারি। এজন্যে আপনাকে হয়ত দিনকয়েক অপেক্ষা করতে হতে পারে। আমাদের লোক প্রায়ই দক্ষিণে যায়। সে কদিন অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে থাকুন। চলুন আপনাকে মিস্ লীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

লাওপেঙ ও মালিনকে সঙ্গে করে নিয়ে তিনি মিস্ লীর কাছে গেলেন। মালিন যখন আসে তখন মিস্ লী ক্লাস নিচ্ছিলেন। তখনই মালিনকে দেখেছেন তিনি। ক্লাসে তখন একটা যুদ্ধ সঙ্গীত শেখান হচ্ছিল। গান শেষ হলে মিস্ লী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বোধন করে বললেন— 'তোমরা আজ কি শিখলে তা যাচাই করতে চাই।...আমরা কিসের জন্য যুদ্ধ করছি—?'

'দেশকে রক্ষা করবার জন্য।' সমস্বরে সকলে উত্তর দিল।

'কার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি ?'

'জাপানীদের বিরুদ্ধে—পূবপারের শয়তানের বিরুদ্ধে।' মনে হল মিস্ লী এই উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না। তাদের মধ্যে একজন বলল—'জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।'

'হ্যাঁ—জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।' মিস্ লী আবার বললেন।

'যুদ্ধে আমাদের প্রধান নীতি কি ?'

'দেশবাসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা।'

'কি ভাবে আমরা শত্রুকে পরাজিত করতে পারব ?'

'সর্বপ্রকারে শত্রুর সরবরাহ লাইন ও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে।'

এইরূপ নানা প্রশ্নের পর ক্লাস শেষ করলেন তিনি। মিষ্টার মাও লাওপেঙ ও মালিনের সঙ্গে মিস্ লীর পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাকে মালিনের ভার নিতে বলে তিনি চলে গেলেন।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে তখন। সকলে সকাল সকাল খেতে বসল। মালিনের পাশে শান্ত প্রকৃতির একটি মেয়ে বসে ছিল। মালিন তার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করল। সে উত্তর দিল—টিয়েনৎসিনএ। তার সঙ্গেই মালিন রাত্রিতে শুতে গেল। মেয়েটির সঙ্গে বিশেষ কেউ মেশে না। এই নূতন পরিবেশে মালিন কি রকম অশ্বস্তি বোধ করছিল। মেয়েটির সঙ্গ তার ভালই লাগল। খাওয়ার পর বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে মালিন তার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য জিজ্ঞাসা করল—'তোমার নাম কি ?'

'যুমি।'

'আমার নাম মালিন। তুমি কি এই গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছ ?'

'বোধ হয় দিয়েছি।'

'এখানে কি ভাবে এলে ?'

'নিতান্ত ঘটনাচক্রে। এখন আমাকে অন্য কোথাও যেতে হবে। জাপানীরা...' এই শেষ কথাটা একটু অস্বাভাবিক মনে হ'ল।—

'তুমি এখানে এসেছ কেন?' মালিনকে জিজ্ঞাসা করল সে।

'ঐ একই কারণে। জাপানীদের জন্য তুমি কি করে এখানে এলে তাই বল।'

'আমি আমার কাকার সঙ্গে টিয়েনৎসিনে যাচ্ছিলাম। পথে কাকা গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দেন। তারপর আমি এখানে আসি। কাকা কুয়ানে গিয়েছিলেন প্রায় তিন সপ্তাহ আগে। আজও তাঁর কোন সংবাদ নেই। বোধ হয় মারা গিয়েছেন।'

'তোমার বয়স কত?'

'একুশ।'

'বিয়ে হয়েছে?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

'স্বামী কোথায়?'

'জাপানীরা তাকে মেরে ফেলেছে?'

'যুদ্ধে?'

'না, মাত্র একমাস আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। জুলাই মাসে জাপানীরা আমাদের গ্রামে ঢোকে। একজন সৈন্য আমাদের বাড়ীতে এল...উঃ কি চরম লজ্জা ও ঘৃণার কথা।' মেয়েটি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। মালিনের বুঝতে বাকী রইল না।

'আমার স্বামী আমাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতেই জাপানীটা তাকে মেরে ফেলল।...তারপর...তারপর...জাপানীটা চলে গেল। আমি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করি...কাকা বাধা দেন। বলেন—'হয়ত ছেলে আছে পেটে—একমাত্র বংশধর।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মালিনকে

জিজ্ঞাসা করল সে—'তুমি জানো···আমি কাউকে কোন দিন কোন কথা বলি নি, তোমাকে বলছি।'

'কি বল?'

'জন্মাবার পর শিশুকে দেখে বুঝা যায় চীনা না জাপানী?'

যুমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।—'তুমি বল বুঝতে পারা যায় কিনা? যদি তাই হয়—তা হলে ঐ শয়তানের বাচ্চাকে আমি কোলে করে মানুষ করব? কথ্খনও না···আমি তাকে মেরে ফেলব।' তার চোখে মুখে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। মালিন বুঝতে পারছিল না কি ভাবে তাকে সান্ত্বনা দেবে।

'শয়তানটা তোমার উপর অত্যাচার করবার আগে কি তুমি সন্তান সম্ভবা ছিলে?'

'তা কি করে বলব? সবে তো একমাস বিয়ে হয়েছিল।'

'ছেলে যদি তোমার স্বামীর মত দেখতে হয় তা হলে তো কোন কথাই নেই। ধৈর্য্য ধর। দেখ কি হয়।'

'যদি তা না হয়···।'

'অনর্থক দুশ্চিন্তা ক'র না। ঐ রকম পাশবিক অত্যাচারে কখনও ছেলে হয় না।'

'তুমি সত্যিই জান? তোমার ছেলে আছে?'

'আমি ঠিকই বলছি। ও ভাবে ছেলে হতে পারে না।'

মালিন যে নিঃসন্দেহে এ কথা বলল তা নয়। তবু যেমন করে হোক তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। যুমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হল; কিন্তু তবু যেন তার সন্দেহ পুরোপুরি গেল না। মালিন আরও নানারকমে তাকে সান্ত্বনা দিল। মনের কথা খুলে বলে যেন যুমি খানিকটা শান্তি পেল। একটু পরে সে মালিনকে বলল—'তুমি তো চলে যাচ্ছ, আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে চল না।'

নিজের দুরবস্থার কথা মালিনের খেয়াল ছিল না। সে বলল 'কাকাকে বলব। কিন্তু যুদ্ধের অঞ্চল দিয়ে আমাদের যেতে হবে। সে অঞ্চল দিয়ে যেতে সাহস হবে?'

'সাহসের আর কি আছে? আর কি খারাপ হতে পারে—মৃত্যু? সে তো ভালই।'

এতক্ষণে যুমির খেয়াল হল যে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছে এসব কথা বলে ভাল করল না সে। তার ওপর মালিন সুন্দরী, পোষাক-পরিচ্ছদও ভাল। তার সঙ্কোচ হতে লাগল। তার মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ বলে উঠল—'তোমরা বড় লোক, সুখী—আমার মত পাড়াগেঁয়ে মেয়ের...।'

মালিন বাধা দিয়ে বলল—'তুমি আমার সম্বন্ধে কিছুই জান না, তাই ও কথা বলছ।'

অনেকক্ষণ হল তারা গল্প করছে। এবার শোবার দরকার। ঘরে আলো নেই। বেশী অন্ধকার হয়ে গেলে অসুবিধা হবে। যুমি বলল—'এবার শুয়ে পড়া যাক্। আর দেরি করলে মিস্ লী বকবে।'

'তুমি মিস্ লীকে খুব ভয় কর?'

'হ্যাঁ—'তিনি বড্ড বকেন। আমার মনের অবস্থা যে কি তা তিনি বোঝেন না—শুধু বলেন, কেন মনমরা হয়ে থাক সারাদিন।'

'এসব কথা তাঁকে বল নি?'

'না, তাঁকে কেন বলতে যাব?'

* * *

পরদিন সকালে মালিন লাওপেঙকে যুমির কথা বলল। যুমির সঙ্গে লাওপেঙের পরিচয় করিয়ে দিল। লাওপেঙ বলল—'যদি সে যেতে চায়—আমাদেরকে নিয়ে যেতেই হবে। তবে এ সম্বন্ধে দলপতির সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

সকলের খাওয়া দাওয়ার পর মালিন ও পেঙ দলপতির সঙ্গে দেখা করতে গেল।

'আপনাদের একটা ব্যবস্থার চেষ্টায় আছি আমি। জাপানীরা দুই রেল লাইন ধরে দক্ষিণমুখে চলেছে। সেখানে জোর যুদ্ধ চলছে। সমস্ত অঞ্চল ধরে আমাদের গেরিলারা আছে। একা হলে সে দিক দিয়ে যাওয়া যেত; কিন্তু সঙ্গে মেয়েছেলে নিয়ে যাওয়া'—এই বলে দলপতি মালিনের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর তাদের টিয়েনৎসিন হয়ে যাওয়াই স্থির হ'ল।' মালিন একটু লজ্জিত হল; তারই জন্য লাওপেঙকে নিজের পথ ছেড়ে এই ঘোরা পথে যেতে হবে। মালিন আস্তে লাওপেঙকে যুমির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। লাওপেঙ দলপতিকে বলল—'আর একটা মেয়ে আছে, আমাদের সঙ্গে যেতে চায়। কোন ব্যবস্থা হয় না?'

'কি নাম তার?'

'যুমি।'

দলপতি একটু ভেবে বললেন—'তার কাকার কাছে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা প্রতিশ্রুত। কিন্তু তার কাকা—সে বোধহয় মারা গিয়েছে।'

এবারে মালিন অনুনয়ের সুরে বলল—'এখানে সে বড়ই মনমরা হয়ে আছে। এভাবে তাকে আমি ফেলে যেতে চাই না। যদি দয়া করে অনুমতি দেন এবং একটা ব্যবস্থা করেন।'

'না, তা বোধহয় উচিত হবেনা—যদি তার কাকা ফিরে আসেন।'

অগত্যা তারা অফিসারের কথা যুমিকে বলল। যুমি কাঁদাকাটা করতে লাগল। পরে লাওপেঙ তাকে বলল—'তুমি চল, অফিসারের কাছে কেঁদেকেটে বলতে পারলে হয়ত একটা ব্যবস্থা হতে পারে।'

লাওপেঙ আবার যুমিকে সঙ্গে করে দলপতির কাছে গেল। দলপতিকে বাইরে ডেকে যুমির অবস্থার কথা সব বলল। উপরন্তু তাকে

দেখাশুনা করবার জন্য যে অন্য একজন স্ত্রীলোকেরও দরকার তাও বুঝাল। অফিসার লাওপেঙকে বললেন—'তার ভার আপনি বরাবরকার জন্য নিতে পারবেন?'

'দরকার হলে আমি এই সর্তে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

লাওপেঙ প্রতিশ্রুতিপত্র লিখে দিলেন। যূমিও টিপসই দিল। দলপতি বললেন—'যূমির কপাল ভাল, তাই আপনার মত একজন লোক পেল। হয়ত এর কাকা বেঁচে নেই। যাক্ দুটো গাধার ব্যবস্থা হয়েছে। আপনাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে হেঁটে যেতে হবে। কাল খুব ভোরে একজন পথ প্রদর্শক এবং গাধা দুটো ঠিক করে রাখবার ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

যূমি বলে উঠল—'আমি হেঁটেই যেতে পারব। আপনি যে আমায় যাবার অনুমতি দিলেন সেই যথেষ্ট। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

যূমির মনটা বেশ প্রফুল্ল। বিকেলের দিকে মালিন লাওপেঙের সঙ্গে বেড়াতে বেরুল। যূমির প্রসঙ্গে মালিন বলল—'তাকে ছেড়ে যেতে পারতাম না—এ রকম যে কত মেয়ের ভাগ্যে ঘটেছে ও ঘটছে!'

'তুমি যে তাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছ এই সবচেয়ে আনন্দের বিষয়।'

হেসে মালিন বলল—'কিন্তু আমরা যে পরস্পরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না।'

মুহূর্তের জন্য লাওপেঙের মন মালিনকে বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হল। প্রথম দিন মালিনের সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু লাওপেঙের সে বয়েস চলে গিয়েছে—নিজের মনের ওপরও তার যথেষ্ট দখল আছে। এমন সময় পেঙের হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে মালিন জিজ্ঞাসা করল—'পোয়া বুঝি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু?' তার কথার মধ্যে বেশ আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতার সুর।

'বোধ হয়।'

'তার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?'

'উদারমনা লোক সে—সাধারণের অনেক উর্দ্ধে। তবে দুঃখের বিষয় যে স্ত্রীর সঙ্গে তার বনিবনা হয় না।'

'এ রকম স্বামীকে পুজো করা উচিত।'

'পোয়ারও দোষ আছে। স্ত্রীর প্রতি সে সুবিচার করে নি। স্বামী হিসাবে স্ত্রীর প্রতি যে কর্তব্য পোয়া তা পালন করে নি।'

'তা জানি, পোয়ার খুড়ীমা লোলা আমায় বলেছিল—তবু আমি বলব স্ত্রীরই দোষ।'

লাওপেঙ হঠাৎ সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কি মনে কর যে এই ভাবে তার স্ত্রীর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে তুমি খুব ভাল কাজ করছ ?'

পেঙের হাতখানা ছেড়ে দিয়ে মালিন বলল—

'পোয়া আমায় বলেছিল আপনার সম্মতি আছে এতে।'

'হ্যাঁ সমগ্র পরিস্থিতিটা ভেবে চিন্তে আমি আপত্তি জানাই নি। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে তুমি এ সম্বন্ধে ভেবে চিন্তে দেখেছ কিনা ?'

'ঠিক করছি কি অন্যায় করছি তার বিচার করা খুবই কঠিন। তবে পোয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কোন আলাপ আলোচনা হয় নি। —আচ্ছা আপনার কি মনে হয় আমি ভ্রষ্টা চরিত্রের মেয়ে ?'

লাওপেঙ এ জাতীয় প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। মালিনের মুখের দিকে চাইল সে—।

'এ প্রশ্ন কেন ?'

'যেহেতু পোয়া আমায় ভালবাসে বা অনেক পুরুষই আমায় ভাল বেসেছে বা পছন্দ করেছে। আচ্ছা আমার সম্বন্ধে পোয়া আপনাকে কিছু বলে নি ?'

'না, সব সময়ই প্রশংসা করত।'

মালিনের মনে হল যে যদি কেউ তাকে বুঝতে পারে তা এই লাওপেঙ। সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে পাশের একটা গাছের তলা দেখিয়ে মালিন বলল—'আসুন পেঙ কাকা এখানে বসা যাক। আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। পোয়াকে বলবার আগে আপনাকে বলা দরকার। সব সময়ই ভয় হয় হয়ত পোয়া আমায় ভুল বুঝবে। আমার বিশ্বাস আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না।'

উভয়ে গাছতলায় বসলে লাওপেঙ বলল—'বল কি বলবে।'

মালিন তার অন্ধকারময় জীবন কথা বলতে সুরু করল—

'মেয়েরা সকলেই চায় বেশ সুপাত্রের সঙ্গে তাদের বিয়ে হোক্, কিন্তু সকলের ভাগ্যে তা ঘটে না। মালিনের বিবাহিত জীবনও মোটেই সুখের হয় নি। স্বামীর ঘর ছেড়ে তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। আসবার সময় তার শাশুড়ীর দেওয়া ছ'শ ডলার সম্বল করে সে টিয়েনৎসিনে যায়। সেখানে এক নাচ ঘরে সে কাজ নেয়। কিন্তু এই নাচ ঘরের চাকরী তার মোটেই ভাল লাগত না। নটীবৃত্তিকে সে ঘৃণার চোখে দেখত। শুধু পেটের ভাতের জন্য সেখানে পড়ে থাকা। দেখতে সে ভালই ছিল, তাই অল্পদিনের মধ্যেই অনেক স্তাবক জুটে গেল তার। উপায়ও ভালই হচ্ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল একজন ভদ্রলোকের নজর পড়েছে তার ওপর—টাকাপয়সা ও নানাবিধ উপহার দিয়ে সে তাকে খুসী করবার চেষ্টা করছে। ভদ্রলোক প্রস্তাব করলো এই নটীবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে তাকে তার সঙ্গে বাস করতে। লোকটি দেখতে মন্দ নয়, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মালিন রাজি হল। বেশ সুখেই ছিল তার কাছে মালিন। প্রাচুর্যের মধ্যে দিন কাটছিল তার। কিন্তু ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের স্ত্রী জানতে পেরে যায় এবং এসে অকথ্য ভাষায় অপমান করে মালিনকে। ফলে সেখান থেকে মালিন চলে এল। আবার আর একজন জুটে গেল ঐরকম। ঐ এক

ভাবেরই পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল পরপর—তবে তারা সকলেই ছিল বিবাহিত। বিয়ে করতে তাদের সকলেই নারাজ। কিছুদিন যায় আর তারা তাকে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু মালিন চায় বিয়ে করে ঘর সংসার পাততে, যেমন সব মেয়েই চায়। রক্ষিতার জীবন মোটেই ভাল লাগে না। রক্ষিতাদের নিয়ে লোকে ভোগ করে, তাদের ভোগের সামগ্রী বলেই গণ্য করে। তারা নাকি টাকার জন্য দেহ দান করে, মন বলে কোন পদার্থই তাদের নেই। অথচ স্ত্রী স্বামীর সব কিছু ভোগ করে, স্বামীর ঐশ্বর্যের ওপর তার পূর্ণ অধিকার আছে; কিন্তু কেউ বলে না যে সে টাকার জন্য দেহ দান করছে। সমাজে তার স্থান আছে, প্রবেশাধিকার আছে সর্বত্র। আর রক্ষিতার কোন স্থান নেই, সকলেই তাকে ঘৃণা করে, সে নাকি প্রভুর যথাসর্বস্ব বের করে নেয় নিজের সুখের জন্য—তার ভালবাসার কোন দাম নেই। অথচ প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য রক্ষিতার আয়াসের অন্ত থাকে না—।···

···যাক্—শেষ পর্যন্ত মালিনের একটি ছেলে হল। তার মনে হল বোধ হয় এবারে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হবে তার। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তু'মাস না যেতেই ছেলেটি মারা গেল। তার মানসিক অবস্থা তখন যেন কি রকম হয়ে গেল। নিজের ওপর কোন যত্নই থাকল না, পুরোপুরি আত্মনিগ্রহে লেগে গেল সে। লোকটিও মালিনের কাছে পূর্ব্বের মত সমাদর না পেয়ে তাকে ছেড়ে চলে গেল। যাই হোক, তাকে বাঁচতে হবে,—তখনও জীবনের প্রায় সবটাই বাকী।··· কিছুদিন না যেতেই দেখা গেল আবার আর একটি ছেলে ঘোরতর ভাবে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছে। সে মালিনকে বিয়ে করতে চাইল। ছেলেটির বাবা মা অন্যত্র তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, কথা দিয়েছিলেন। ছেলেটি কিন্তু বেঁকে বসল—তার মা বাবাকে সে বিয়ে ভেঙে দিতে বলল। এদিকে যে মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল সে জানতে

পারল সব। একদিন তার মাকে নিয়ে সে মালিনের কাছে এসে হাজির। তারা মালিনকে বহু অনুনয় বিনয় করল, তার পথে মালিনকে বাধাস্বরূপ না হতে অনুরোধ করল। মালিন ইচ্ছে করলে নিজের অনুকূলে কাজ হাসিল করতে পারত; কিন্তু মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে তার দয়া হল। মালিনের অনুরোধে ছেলেটি সেই মেয়েকেই বিয়ে করল।

মালিন চুপ করল—কিছুক্ষণের জন্য; একটু ম্লান হেসে পরে আবার পেঙকে জিজ্ঞাসা করল,—'এই সব শুনে আমার সম্বন্ধে কি ধারণা হচ্ছে আপনার?'

'কোন পরিবর্তন হয় নি আমার ধারণার।…আচ্ছা—তোমার কি কোন আত্মীয়-স্বজনই ছিল না? যারা তোমায় সাহায্য করতে পারত বা তোমাকে পরামর্শ দিয়ে চালিত করতে পারত?'

'না, মা মারা যাবার পর আমি একেবারে নির্বান্ধব আত্মীয়-স্বজন হীন এবং অসহায় অবস্থায় পড়ি।'

মালিনের মুখের দিকে চাইল লাওপেঙ। মুখ নীচু করে বসে আছে মালিন—চিন্তাক্লিষ্ট ম্লান সে মুখ,—দেখলে দয়া হয়।

মালিন আবার বলল—'আপনি মেয়েদের মনের কথা জানেন কিনা জানি না, তবু বলছি—যাকে ভালবাসে মেয়েরা, তাকে সুখী করবার জন্য তারা সব কিছু করতে পারে। আমি পোয়াকে ভালবাসি…কিন্তু…।'

'তুমি পোয়াকে সব কথা বল—সে বুঝবে। স্বাধীন-চেতা লোক সে। তবে আগে থেকে তার কাছে সব কিছু পরিষ্কার করার দরকার, যাতে ভুল বুঝবার অবকাশ না থাকে তার। আর—তুমি, তাকেই বিয়ে করতে চাও, তার ধনদৌলতকে নয়।'

'ধন-দৌলত! কে বলল যে আমি তার ধন-দৌলত বা বিষয়-সম্পত্তির লোভে তাকে বিয়ে করতে চাই?'

'কেউ বলে নি—কিন্তু লোকে হয়ত তাই ভাববে।'

'লোকের বলাতে কি এসে যায়। আমাদের বিয়ে হলে অবশ্যই অন্য মেয়েরা সেটাকে ভাল চোখে দেখবে না। তারা সব সময়ই আমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাইবে—মুখ মুচকে হাসবে। অথচ তাদের সঙ্গে আমার কোন পার্থক্যই নেই—। একমাত্র অপরাধ, আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছি—আমার বাবা মা টাকা খরচ করে এই বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন নি আমার।'

'তুমি জান না মেয়েরা অন্য কোন সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পারে না। তাছাড়া সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও তোমায় দেখতে হবে। (বিয়ের মধ্যে খানিকটা প্রেম হয়ত আছে; কিন্তু আসলে এটা একটা সর্তাধীন ব্যবসা। এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা—সমাজের জন্য সন্তানোৎপাদন করা।) অন্ততঃ মেয়েরা বিয়েটাকে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচার করে।'

'আচ্ছা পেঙ্‌কাকা—এসব কথা পোয়াকে বলব—সে ঠিক বুঝবে তো?...পোয়াকে হারালে আমার যে কি অবস্থা হবে তা আমি নিজেই জানি না।'

হেসে লাওপেঙ বলল—'না, তোমার জীবনে এত কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও তুমি আজও ছেলেমানুষ আছ। ভগবান করুণ, তোমার মন যেন এই রকমই থাকে।...হ্যাঁ পোয়াকে বলবে। সে ঠিক বুঝবে। তোমাদের পরস্পরের মনে যেন কোন খুঁৎ না থাকে। সেইখানেই প্রমাণ হবে তোমরা কে কাকে কতখানি ভালবাস।'

আলোচনাটা প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাবার জন্য লাওপেঙ বলল—'চল ওঠা যাক্—যুমি একা রয়েছে। তুমি পার তো তাকে খুসী রাখবার চেষ্টা ক'রো। তার বড় দুরবস্থা।'

লাওপেঙের কথা শুনে মালিনের খুব লজ্জা হল। সে এতক্ষণ নিজের কথাই ভাবছিল, আর এই উদার হৃদয় লোকটি...।

পেঙের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মালিন উঠে পড়ল। লাওপেঙ নানাকথা চিন্তা করছিল। তার মুখখানা গম্ভীর। খুবই উদার মতাবলম্বী লোক সে। তবু মালিন সত্যই সদ্বংশজাত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। অত্যন্ত চরিত্রবান পুরুষ সে। নারীর চিন্তা কোনদিনই তাকে বিব্রত করে তোলে নি। আত্মসংযম তার যথেষ্ট। কিন্তু আজ বোধহয় মালিন তার মানসিক সাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। নারীদেহের যে একটা প্রলোভন আছে, মালিনের কথা শুনে তার নতুন করে মনে হল কথাটা। মালিনকে আর মালিন হিসাবে সে চিন্তা করতে পারে না। তার কথা মনে হলেই—তার রূপ, তার দেহ তার চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। মালিনের ঘনিষ্ঠতা বোধহয় তাকে আরও সচেতন করে তুলেছে।···না, পোয়া যে তাকে ভাল বেসেছ—তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই। তাকে অনায়াসে ভালবাসা যায়।···কিন্তু তাকে সাংহাইএ পৌছে দিতে হবে পোয়ার জন্য···না না, কি সব মাথার মধ্যে ঘুরছে। বন্ধুকে প্রতারণা করবে? কখনই না—। না, এ সব চিন্তাও দূর করে দেওয়া দরকার। লাওপেঙ আবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল—

'তুমি গাধায় চড়তে পার তো?'

'না। সে এক মজার ব্যাপার হবে।'

'খুব কঠিন নয়। চেষ্টা করলেই পারবে। তবে আমাদের এমন ভাবে যেতে হবে যে লোকে দেখে মনে করে আমরা গ্রাম্য চাষী।'

'যূমি সঙ্গে থেকে ভালই হবে। জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে যথাযথ উত্তর দেবে।'

'খুব সহজ নয়। তোমায় দেখলে যে কেউ বুঝে ফেলবে যে তুমি শহুরে। তুমি যদি মেয়ে না হতে তা হলে ভালই হত।'

'তা হলে না হয় পুরুষের ছদ্মবেশ করব।'

'তা কি করে করবে?'

'আপনি একটা পাশে ঝুলান পশমী টুপি সংগ্রহ করুন—যেমনটি এ অঞ্চলের ব্যবসাদাররা পরে, তা হলেই হবে, দেখবেন।'

॥ ৮ ॥

পরদিন খুব ভোরেই তারা বেরিয়ে পড়ল। মালিনের পোষাক দেখে অফিসার এবং অন্যান্য সকলেই হেসে ফেলল। তাকে বেশ স্কুলের ছেলের মত লাগছিল। মালিন গাধার পিঠে এবং লাওপেঙ ও য়ুমি হেঁটে যাচ্ছিল। মালিন গাধায় চড়তে একেবারে অনভ্যস্ত—যে কোন সময় পড়ে যাবার সম্ভাবনা। সাবধানেই চলছিল সে। অবশ্য গাইডও সঙ্গেই ছিল। য়ুমিকে খুব জোরে জোরে হাঁটতে হচ্ছিল। মালিন জিজ্ঞাসা করল তাকে—'তোমার জোরে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না?'

'না—এ আমার অভ্যাস আছে। এর আগেও আমি গেরিলাদের সঙ্গে হেঁটেছি।'

'এদের সঙ্গে কতদিন এসেছ?'

'সপ্তাহ তিনেক আগে। আমার কাকা যখন দক্ষিণে যুদ্ধ করতে চলে গেলেন তখন থেকে আমি এদের সঙ্গে। সৈন্যদের রান্নাবান্না করে দিতাম—তাদের খাওয়াতাম।...কিন্তু এদের কথাবার্তা আমি কিছুই বুঝি না। তুমি তো সহুরে—তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে কষ্ট হয় না। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ইত্যাদি কত কি নিয়ে যে তারা কথা বলে। আবার কাউকে যদি নামধরে বলি তা হলে তারা রেগে যায়। আমায় নাকি 'কম্‌রেড' বলে ডাকতে হবে।'

লাওপেঙ মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিল। সে য়ুমিকে জিজ্ঞাসা করল—'তারা তোমায় কি শেখাত?'

'তারা শেখাত স্ত্রী পুরুষ সবাই সমান। কিন্তু আমি তো বুঝি না তা কি করে হয়। আমাদের দেশে তো কব্জির জোর নিয়ে বিচার হয় কে কার সমান।'

সকলেই হেসে উঠল একসঙ্গে।

মালিন জিজ্ঞাসা করল—'তোমার সঙ্গে আরও অনেক মেয়ে ছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সকলেই তো বাড়ীঘর ছাড়া। মেয়েদের পাড়াগাঁয়ে বাস করা কঠিন। জাপানীরা এলে মেয়েদের তো আগেই সরান হয়। জাপানীরা চলে গেলে বাড়ীর লোক এসে আবার তাদের নিয়ে যেত। আর যখন শত্রুরা বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যেত, তখন বাড়ীর পুরুষরাও এসে দলে ভিড়ত।'

লাওপেঙ বলল—'তুমি গেরিলাদের কথা বলছ না আশ্রয়প্রার্থীদের কথা বলছ?'

'ও দুই-ই সমান। সকলেই বাড়ীঘর ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তার মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে যায় তারা গেরিলা, আর যারা যায় না তারা আশ্রয়প্রার্থী।'

রাস্তায় এক জায়গায় বসে তারা খাওয়া সেরে নিল। প্রায় সন্ধ্যার সময় তারা এক গ্রামে পৌছাল। গ্রামের নাম মা-তৌ-চেন। এখানকার গেরিলা নেতা সাদর অভ্যর্থনা জানাল তাদের। একে দেখলে মনে হয় সাধারণ চাষী গৃহস্থ। নাম সাঙ্‌কোন। গত যুদ্ধে সৈন্যদলে ক্যাপ্টেন ছিল—একখানা হাত কাটা গিয়েছিল। এবারে গেরিলাবাহিনী গঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। অতিথিদের নিয়ে যেতে বলে—যুদ্ধের সম্বন্ধে, দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নানারকম আলাপ আলোচনা করতে লাগল সে।

পরদিন গাইড ফিরে গেল। সাঙকোন নিজেই লাওপেঙের সঙ্গে যাবে একটা শত্রুশিবির হানা দেবার ব্যবস্থা করতে। জনকয়েক

মেয়েকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা করতে হবে। এক গ্রাম থেকে জাপানীরা দশটা মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আগে অবশ্য গ্রামের লোকেরাই মেয়ের লোভ দেখিয়ে জাপানীদের বাড়ীতে নিয়ে এসে মারত। কিন্তু আজকাল আর তা পারা যায় না। ঐ দশটি মেয়েকে জাপানীরা তাঁবুতে নিয়ে গিয়েছে। শ'দুয়েক সৈন্য আছে ঐ তাঁবুতে। গতকাল খবর এসেছে যে অনেক সৈন্য দক্ষিণে চলে গিয়েছে এখন মাত্র পঞ্চাশ ষাট জন আছে। আজ রাত্রেই যা হয় কিছু করতে হবে। ঐ দশজন মেয়ের মধ্যে গ্রামের মোড়লের ভাইঝিও আছে। লাওপেঙ তার সঙ্গী মেয়েদুটির জন্যও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। সাঙ্ কোন বলল—'আপনার ভয় নেই। আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে প্রায় পনের ষোল লি তফাতে এই কাণ্ড হবে।'

খাওয়া সেরে তারা বেরিয়ে পড়ল। প্রায় সন্ধ্যার সময় তারা একটি ছোট গ্রামে পৌছাল। গ্রামে কয়েক শ লোক লাঠি সোটা নিয়ে জড় হয়েছে। জন পনের লোকের কাছে বন্দুকও আছে। তারা জাপানীদের আক্রমণ করার উল্লাসে হল্লা করছে। দূর থেকে ক্যাপ্টেন সাঙ্ কোনকে দেখতে পেয়ে সোল্লাসে অভ্যর্থনা করল তারা। গ্রামের মোড়ল এসেও ক্যাপ্টেনকে অভ্যর্থনা করল। অন্যান্য গ্রামের মোড়ল যারা এসেছিল ক্যাপ্টেন গোপনে পরামর্শ দিলেন তাদের। এমন সময় এই গ্রামের মোড়ল 'লোটাকো'র খোঁজ করতে একজন গিয়ে লোটাকোকে ডেকে নিয়ে এল। লোটাকো একজন অসমসাহসী দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। গ্রামবাসীদের সকলেরই সে দাদা। লোটাকো এসে প্রথমেই মোড়লকে বললে—'আমায় আবার কেন?' তার মেজাজ খুব খোস্—'দেখলাম প্রায় পঞ্চাশ জন ছোরাছুরি নিয়ে আসছে, শত্রুরাও তো ঐ রকম। মাথাপিছু একজন হলেই তো যথেষ্ট। এখানেও তো দেখছি কয়েক শ—সবাই মিলে তো টিপেই মেরে ফেলবে ঐ কজন জাপানীকে।'

'না, তোমায়ও দরকার। ঐ ছোরার দল নিয়ে তোমায় যেতে হবে। বন্দুক চাই—একটা দিতে পারি?'

'না, বন্দুকের দরকার নেই—তার চেয়ে ছুরিই ভাল—তাড়াতাড়ি চালান যায়।'

র‍্যাটলস্নেক ক্যাপ্টেনের কথা আগেই শুনেছিল, সে ক্যাপ্টেনকে বলল—'আমি আজ রাত্রে কি করতে পারি দেখি।' তারপর মোড়লের দিকে তাকিয়ে বলল—'আমি যদি আপনার ভাইঝিকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে না পারি তা হলে আমার নাম আর র‍্যাটলস্নেক রাখব না।'

তারা সবাই খেতে বসলে র‍্যাটলস্নেক জিজ্ঞাসা করল—'আমরা কি করব—প্রথমে কি ছাউনিতে আগুন ধরিয়ে দেব তারপর বেটারা বেরুলে একটা একটা করে শেষ করব?'

ক্যাপ্টেন বললেন—'না তাতে বিপদ হতে পারে। আমরা জানি না আমাদের মেয়েরা কোথায় আছে। বরঞ্চ যদি দু'একটা গুলি প্রথমে করি তা হলে তারা বেরিয়ে আসতে পারে—তখন ছুরির উপর ভরসা করতে হবে।'

একটি বছর আঠার বয়সের ছেলে—তার বৌকেও জাপানীরা নিয়ে গিয়েছিল, বলল—'কিন্তু অন্ধকারে গুলি করতে গিয়ে যদি আমাদের নিজেদের মেয়েরাই যখম হয়? আমাকে একজন পুলিশ অবশ্য খবর দিয়েছিল যে ঐ বড় ঘরটাতে আমাদের মেয়েদের আটকে রেখেছে ওরা—আর সৈন্যেরা থাকে বাগানের স্কুল বাড়ীটাতে।' লাওপেঙ বলল—'শত্রুদের মারবার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের মেয়েদের রক্ষা করা।'

কয়েক গ্লাস মদ খাবার পর র‍্যাটলস্নেক চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। সে সকলকে সম্বোধন করে বলল—'দেখ আজ রাত্রে ভগবান আমায় সুযোগ

দিয়েছেন এই জাপানী নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার। কিন্তু তোমাদের সকলের সুমুখে আগেই বলে রাখছি যদি মেয়েদের উদ্ধার করতে পারি তা হলে চুয়াংকু আমার।'

অন্য একজন বলে উঠল—'তাই হবে—তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীতা কেউ করতে যাবে না।'

চুয়াংকু হচ্ছে এক বিধবার মেয়ে। শত্রুদের হাতে যে কটা মেয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র সেই অবিবাহিতা। তার মার সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ প্রথমত সে দুশ্চরিত্রা আর দ্বিতীয়ত তার মা ও সে স্বেচ্ছায় শত্রু শিবিরে যেতে রাজি হয়েছিল দেশের কাজ করবার জন্য। গ্রামের মেয়েদের এইভাবে তারা শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করছে বলে আজকাল সবাই তাদের ভাল চোখে দেখে।

জমাট অন্ধকার—সিপ সিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নিশীথ রাত্রিতে তারা সকলে বেরিয়ে পড়ল। যাত্রার আগে ক্যাপ্টেন আবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—'কেউ টু-শব্দটি পর্য্যন্ত করবে না। আমি সঙ্কেত দিলে আক্রমণ করবে। যারা আহত হবে তারা যাতে পালিয়ে আসতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখবে, আর নিজেদের লোককে খেয়াল রাখবে—তা না হলে অন্ধকারে যা তা একটা কিছু হয়ে যেতে পারে।'

রাত্রে পাড়ার বয়স্ক কেউই ঘুমাল না। সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল কি হয় জানবার জন্য। মোড়লের বাড়ীতে আলো ও আগুন জ্বালা রইলো। ডাক্তারও ওষুধপত্র তৈরী থাকল সেখানে। লাওপেঙ গল্প করতে লাগল মোড়ল ও ডাক্তারের সঙ্গে। মালিন এবং যুমিকে জোর করে শুতে পাঠান হল। মোড়ল বার কয়েক উঠে পাড়াটা একবার করে ঘুরে এল।

ভোর পাঁচটায় একটি ছেলে ফিরে এসে খবর দিল সব কিছু নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। একটি জাপানীও পালাতে পারে নি—সকলেই মারা পড়েছে, তবে দুঃসংবাদের মধ্যে দলের দুটি ছেলে মারা পড়েছে এবং জনকয়েক জখম হয়েছে। পাড়ার মধ্যে খবর চলে গেল।

আস্তে আস্তে সবাই ফিরে এসে সেই উঠানে জমা হল। মেয়েরা জল এনে দিতে তারা সকলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে তাদের সকলকে গরম খাবার পরিবেশন করা হল।

জালে মাছপড়ার মত অবস্থা হয়েছিল জাপানীদের। কয়েকজন পাহারাদার ছাড়া সকলেই ঘুমাচ্ছিল। গেরিলারা নিঃশব্দে পাহারা-ওয়ালাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুরি দিয়ে শেষ করে দেয় তাদের। প্রায় মিনিট সাত আট লেগেছিল সমস্ত কিছু হাসিল করতে। ঘুম থেকে উঠে বন্দুক নেবার আগেই অনেক জাপানী মারা পড়ে। বাইরের মেসিন-গানটা আগেই হস্তগত করা হয়েছিল। জেগে উঠে কয়েকজন জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করে—কিন্তু মেশিনগানএর গুলিতে তারাও মারা পড়ে। কয়েকজন কাছের দিঘিটা সাঁতরে পালাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু তীরে যারা ছিল তারা গুলি করে সবকজনকেই শেষ করে দেয়।···একটা দলের ওপর ভার ছিল মেয়েদের উদ্ধার করার। মেয়েরা সকলেই একটা ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছিল। তারা তো প্রথমে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। সেখানে চুয়াংকু ও তার মা ছিল না। র‍্যাটলস্নেক এধারে অন্ধকারেই চুয়াংকুর খোঁজ আরম্ভ করেছিল। গুলির আওয়াজ শুনেই চুয়াংকু তার মাকে টেনে নিয়ে বাইরে আসে। একটি জাপানী তার দিকে ছুটে আসতেই হাতের কাছে একখানা কোঁদাল পেয়ে তাই দিয়ে জাপানীটাকে সে মেরে ফেলে।

সকলে খেতে খেতে বর্ণনা করতে লাগল কি ভাবে কাজ হাসিল করা হল। মেয়েরা তাদের জাপানী ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা বলল। ডাক্তার

আহতদের ক্ষত ধুইয়ে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। যে দুজন মারা গিয়েছিল তাদের মৃতদেহ বাড়ীতে পৌছে দেওয়া হল। তখন সকাল হয়ে গিয়েছে।

বিকালে ক্যাপ্টেন লাওপেঙ মালিন ও যুমির যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। একজন গাইড সঙ্গে দিয়ে তাদের যাংচুনে পৌছে দেবার নির্দ্দেশ দিলেন। যাংচুনে পৌছে গাইডটি তাদের জন্য একটি নৌকা ঠিক করে দিল। নৌকাটি যাতে পুলিসের লঞ্চের সঙ্গে টেনে নিয়ে যায় তার ব্যবস্থাও করে দিল। এর জন্য লাওপেঙকে পঞ্চাশ ডলার ঘুষ দিতে হল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় তারা টিয়েনৎসিনে পৌছাল।

দুদিন পরে খবরের কাগজে তারা দেখল সেই গ্রামটি জাপানীরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। কে জানে সেই মোড়ল, র‍্যাটলস্নেক, চুয়াংকু এবং আর সকলের ভাগ্যে কি ঘটেছে।

॥ ৯ ॥

টিয়েনৎসিনে হোটেলের একটি ঘরে বিছানার উপর যুমি বসেছিল। পাশের বিছানায় মালিন তখনও ঘুমাচ্ছে। দুদিন আগে এসে তারা পৌছেছে। দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে একটিতে লাওপেঙ এবং অপরটিতে মালিন ও যুমি থাকে। হাত মুখ ধুয়ে যখন যুমি ঘরে ঢুকল তখন ঘুম ভাঙ্গল মালিনের।

'পেঙ কাকা উঠেছেন?'

'কি জানি, দেখে আসি।'

'না, না, অনর্থক যেতে হবে না' বলে মালিন টেলিফোনে লাওপেঙকে ডাকল—'কে পেঙ্ কাকা··· ? নিশ্চয়ই ঘুম ভাল হয়েছে? আপনার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে?' হ্যাঁ, এক্ষুনি।'

যুমি পাঁড়াগাঁয়ের মেয়ে, এই কাণ্ড দেখে তো অবাক্।

মালিন উঠে হাতমুখ ধুয়ে যখন পোষাক পরিবর্তন করছে তখন যূমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল—'পেঙ কাকা কি সত্যিই তোমার কেউ হন না?'

'না।'

'আমি ভেবেছিলাম…।'

'কি ভেবেছিলে বল।'

'আমি বুঝতে পারিনি, জিজ্ঞাসা করবারও সাহস হয় নি। তুমি তাঁকে যে ভাবে যত্ন কর তাতে ভেবেছিলাম যে তোমার সঙ্গে বোধহয় কোন সম্পর্ক আছে, হয়ত বা তোমার প্রণয়ী বা ঐ জাতীয়…।'

যুমি এমন ভাবে বলল যে মালিন না হেসে পারল না।

'নাঃ, তোমার মত বোকাকে নিয়ে আর পারা যায় না। তাঁর বয়স কত বেশী। তোমার মাথায় এ ধারণা কি করে এল?'

'তুমি তাঁকে যে রকম যত্ন কর…।'

মালিন হেসে বলল—'থাক ওসব কথা আর বল না।'

প্রসাধন শেষ করে মালিন পাশের ঘরে গেল। লাওপেঙ খবরের কাগজ পড়ছিল। মালিনকে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করল—'পিপিঙের কোন সংবাদ পেয়েছ?'

'না'

'শোন। টাজাং জাপানীরা দখল করেছে, এখন চীনাদের পিছু হটা ছাড়া আর কোন পথ নেই। যত শীঘ্রি সম্ভব তাদের এখান থেকেও চলে যেতে হবে। নানকিং-এর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে যাওয়া খুবই কঠিন হবে।'

টেবিলের ওপর টিপয়ে চা ছিল। মালিন এক কাপ লাওপেঙকে দিয়ে নিজেও এক কাপ নিল। মালিন লক্ষ্য করল লাওপেঙের

কামান হয় নি। সে জিজ্ঞাসা করল—'আপনি কামান নি কেন ?'

'কি দরকার ?'

'দরকার নেই বুঝি !' মালিনের চোখে পড়ল লাওপেঙের বিছানাটাও অগোছাল হয়ে আছে।

মালিন উঠে সেটা ঠিক করতে গেলে লাওপেঙ আপত্তি জানিয়ে বলল—'থাক্ না। হোটেলের চাকর এসে ঠিক করে দেবে।'

'তারা কোন কালে করবে তার ঠিক নেই। এ মেয়েদেরই কাজ।'

যূমিকে ডাকাতে সেও এসে বসে ছিল। ঘরের নানারকম খুঁটিনাটি কাজ করতে লাগল মালিন। ঘরটা এতক্ষণে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গোছাল হল।

ঠাট্টা করে লাওপেঙ বলল—'না পোয়ার কপাল ভাল যে তোমার মত বৌ পাবে। বিয়ে হলে দেখছি তোমাদের কাছে গিয়ে আমাকে থাকতে হবে।'

যূমি জিজ্ঞাসা করল—'পোয়া কে ?' মালিন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। লাওপেঙ উত্তর দিল—'যার সঙ্গে মালিনের বিয়ে হবার কথা হয়েছে।'

'কবে বিয়ে হবে—?'

যূমির কথায় দু'জনেই হেসে উঠল।

সে দিন বিকেলে মালিন একলাই বেড়াতে বেরিয়েছিল। সন্ধ্যার সময় যখন ফিরল তখন তার মুখ ফ্যাকাশে। লাওপেঙ তার এই অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করল—'কোথায় গিয়েছিলে ? কি ব্যাপার ?'

পাশের ঘরে যূমি তখন বিছানা করছিল। সেদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মালিন বলল—'যূমি আগে ঘুমাক তারপর বলব। নৌকা ছাড়বার আগে আমি আর বেরুব না।'

মালিন উঠে গিয়ে যুমিকে বলল—'তুমি শুয়ে পড়, পেঙকাকার সঙ্গে কতকগুলো কথা আছে আমার—আমি পরে শোব।' লাওপেঙের ঘরে মালিন ফের ফিরে এল—নানা কথাবার্তা বলে দুজনে অনেকক্ষণ কাটাল। যুমির তখন নাক ডাকছে। আশে পাশে অন্যান্য সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। মালিন একবার বাইরে এসে দেখল কেউ কোথায়ও আছে কিনা। তার পর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সিলিং এর বাতিটাও নিভিয়ে দিল। টেবিলের ওপর একটা বাতি কেবল টিম টিম করে জ্বলছে। তার পর লাওপেঙকে সোফার পাশে বসতে বলে আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করল—'আমি প্রথম থেকেই টিয়েনৎসিনে আসতে চাইনি। যুদ্ধবাধবার পর আমি এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। পোয়ার খুড়ী লোলা আমার বাল্যবন্ধু, সেই আমাকে পোয়ার বাড়ী নিয়ে গিয়েছিল। এখানে আমাকে অনেকেই চেনে। তাদের কাছে ধরা পড়তে চাই না।'

'আমার মনে হচ্ছে আজ বিকেলে কিছু একটা ঘটেছে। তুমি যখন ফিরে এলে তখন তোমার মুখ চোখ যেন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল…।' লাওপেঙ বলল।

'হ্যাঁ ঘটেছে। জাপানীদের এবং বিশ্বাসঘাতকদের ভয়ে আমি সন্ত্রস্ত। তারা আমায় চেনে।'

'কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?'

'রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনি তো জানেন যে পোয়ার বাড়ী হতে আমি চলে এসেছি জাপানীদের ভয়ে।…কিন্তু আরও অনেক কিছু বলি নি আমি পাছে সে ভুল বোঝে এই ভয়ে। আপনাকে বলছি শুনুন।'…একটু থেমে মালিন বলল—'আপনাকে আগেই বলেছি একটা লোকের রক্ষিতা হিসাবে আমি এখানে বাস করতাম। লোকটি ছিল একটি মিলের মালিক, বেশ টাকাপয়সাওয়ালা।

মাণ্ডুতেও তার অনেক কখানা বাড়ী আছে। আমাকে যে সে রেখেছিল তার স্ত্রী তা জানত। যাই হোক সে কিছু কেয়ার করত না। লোকটি আমায় নিয়ে ফুর্ত্তি করত থিয়েটার বায়স্কোপে যেত। তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও আমার আলাপ ছিল। মাঝে মাঝে দু'চারজন বন্ধুবান্ধবকেও আমার কাছে নিয়ে আসত সে। তারপর যুদ্ধ বাধল। জাপানীরা যখন 'মারকোপোলো' ব্রিজের কাছে এসে গিয়েছে তখন সে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। কারণ তার সমস্ত সম্পত্তিই এই টিয়েনৎসিনে —জাপানীরা যদি দখল করে তা হলে সবই যাবে।···সপ্তাহ খানেক বাদে একদিন এসে সে বলল—সব ঠিক হয়ে গিয়েছে—মেজাজ তখন তার ভারী খুসী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে ঠিক হ'ল—কিন্তু সে আমার কাছে ভাঙ্গল না সে কথা।

তারপর থেকে প্রায়ই অপরিচিত লোক সঙ্গে নিয়ে আসত সে। দৈনিক সন্ধ্যেবেলায় এদের নানারকম আলাপ-আলোচনা চলত। তাদের দেখলেই মনে হত কবর থেকে যেন কতকগুলো মড়া উঠে এসে বসেছে। তাদের মুখ চোখ ফ্যাকাসে—সর্বদাই সন্ত্রস্ত। চুপচাপ তাদের কথাবার্ত্তা শুনে শুনে আমার মনে হত তারা সব বিশ্বাসঘাতক, জাপানীদের চর। আমার লোকটিকে এ কথা বলতে গেলাম—সে রেগে গেল। মাঝে একবার সে পিপিঙ গেল। সেখান থেকে ঘুরে এসে কেবলই জাপানী ইম্পিরিয়াল আর্মির কথা বলতে আরম্ভ করল সে। এই সব ব্যাপারে একদিন কথান্তর হতেই সে আমায় সাবধান করে দিল, বলল—দেখ, তোমায় টাকা পয়সা দিচ্ছি, এখানে রেখেছি, যেমন আছ তেমনটি থাক, আমার কাজের মধ্যে মাথা গলাতে এস না। একদিন তার এক বন্ধু ডাইরিণ হতে এসে খুব গর্বের ভঙ্গীতে বললে যে সে সব কথা জানে এবং ঐ বাহিনীর জেনারেলের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তার নাম নাকি জেনারেল চাই··· ।'

'কে? চাই সিউহিয়ান?'

'হ্যাঁ মুখখানা তেলচুকচুকে, ছোট ছোট গোঁফ—চোখ দুটো ভেড়ার মত।'

'তা হলে তুমি কি লিয়াঙ....!'

'আপনি তার কথা জানেন নাকি?'

'হুঁ! তাহলে তুমি বেশ ঘোরাল ব্যাপারেই জড়িত!'

'বলি শুনুন্। তারপর দেখি আমার নামে কেবলই চিঠি টেলিগ্রাম ইত্যাদি আসতে লাগল। আমার উপর হুকুম ছিল আমি যেন ওসবে হাত না দিই। তবু আমি দু'একখানা লুকিয়ে পড়তাম। একদিন ঐরকম এক খাম খুলে পড়ে দেখি—চিঠিখানা এসেছে হঙ কঙের ওয়াঙ কেমিনের কাছ থেকে। যথারীতি চিঠিখানা বন্ধ করে আবার আমি রেখে দিলাম। সন্ধ্যাবেলায় সে এলে আমি তাকে বললাম—তোমরা কি করছো! দেশটা শত্রুদের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করছো? সে খুব অপমানিত বোধ করে আমার ওপর রেগে উঠল। আমায় বলল—কেন চিঠি খুলেছিলে? আমারও রাগ হল। আমি বললাম—বেশ করেছি—আমার নামের চিঠি আমি খুলব। সে খুব নরম হয়ে গেল। বলল—দেখ আমাদের কাজে তোমায় সাহায্য করতে হবে। তুমিই ভেবে দেখ চীনারা কি কখনও জাপানীদের সঙ্গে পারবে? জাপানীরাও এদেশের সাহায্য ছাড়া চালাতে পারবে না। সুতরাং আমরা কেন ফাঁকে পড়ি। যদি অবস্থা ফেরে তাহলে তোমারই লাভ, যথেচ্ছা ভোগবিলাস করতে পারবে। আমি বললাম—এই সব ঘৃণ্য কাজের মধ্যে আমি যেতে পারব না। সে বলল—তোমায় এর মধ্যে টানতে চাই না তুমি শুধু চিঠিগুলি নিয়ে আমাদের জন্ম রেখে দেবে।

আমি মনে মনে স্থির করলাম এখান হতে চলে যাব। মুখে কিছুই বললাম না। রাজনীতি নিয়ে কোনকালেই আমার মাথাব্যথা নেই।

কাজেই তাদের চিঠিপত্রও আর আমি খুলতাম না। তারপর একদিন দেখি চাই-সিউ-হিয়ান তার এক রক্ষিতাকে নিয়ে এসে হাজির। লিয়াঙ আমায় বলল যে ভবিষ্যতে এরাই নাকি হবে চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক, আমি যেন তাদের সঙ্গে বিশেষ ভাল ব্যবহার করি। সিউহিয়ান আমার সঙ্গে মিশতে চাইত—আমরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতাম। চাই নানারকম আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখত আর আবল তাবল বকতে বকতে কুৎসিতভাবে হাসত।…কিন্তু আমার বিবেক চাইছিল না এদের সঙ্গে থাকতে। ১৪ই আগষ্ট যখন সাংহাই-এ যুদ্ধ বাধল—ঐদিন আমি আমার জিনিষপত্র ও গহনাগাটি নিয়ে কাউকে না বলে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। সেখানে অন্য নামে পরিচয় দিলাম। ষ্টীমারে 'সীট' পেলেই সাংহাই চলে যাব স্থির করলাম। সহরের মধ্যে তখন প্রায়ই খুন জখম হচ্ছে, বোমা ছোড়াছুড়ি হচ্ছে। দেশপ্রেমিকরা চেষ্টা করছে বিশ্বাসঘাতকদের মারতে আর বিশ্বাসঘাতকরা দেশপ্রেমিকদের মারতে বা জাপানীদের হাতে ধরিয়ে দিতে। আমি যে হোটেলে ছিলাম, সেই হোটেলের একটি ছেলেও জখম হয়েছিল। তার এক বন্ধু তাকে দেখতে আসত। আমি জানতে পারলাম এরা ঐ বিশ্বাসঘাতকদের শত্রু। আমি নিজের পরিচয় না দিয়ে আমার পূর্ব্ব বাসার ঠিকানা দিয়ে বলে দিলাম যে সেখানে সুই মালিন নামে একটা মেয়ের নামে অনেক চিঠিপত্র আসে এবং সেখানের একটা দেরাজে অনেক মূল্যবান কাগজপত্র আছে। সেই রাত্রেই তারা সেই বাড়ী আক্রমণ করে। হয়ত বা কাগজপত্রও তাদের হস্তগত হয়েছিল কিন্তু আমি আর কিছু জানবার সুযোগ পাই নি, কারণ আমি ইতিমধ্যে হোটেল বদল করেছিলাম। দু'দিন পরে খবরের কাগজে দেখলাম আমার নাম দিয়ে খবর বেরিয়েছে যে অমুকের রক্ষিতা কিছু গহনাপত্র নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, পুলিস তাকে ধরবার চেষ্টা করছে। আমার ভয় হল। সহর তখন

জাপানীদের হাতে। তাদেরই পুলিশ আমার খোঁজ করছে। সুই মালিন নামেই ষ্টীমারে সীট্ বুক করা আছে। জিনিষপত্রও প্যাকিংএ ঐ নামেই লেবেল দেওয়া আছে। ষ্টীমার ছাড়তে তখনও দু দিন দেরী। আমি সেই রাত্রেই ট্রেণে পিপিঙে চলে গেলাম।…এখন ও কথা ভাবতে গেলেও গা শিউরে ওঠে। আমার হাতখানা দেখুন, একথা বলতে কি অবস্থা হয়েছে।'

লাওপেঙ মালিনের হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে দেখল ঘামে একেবারে ভিজে গিয়েছে।—'ওঃ, বলিহারী সাহসী মেয়ে তুমি।'

'কিন্তু ভেবে দেখুন আমার সারা জীবনটাই এইভাবে ভাগ্যবিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে গেল। আমি রক্ষিতা ছিলাম, টাকাপয়সা ও গহনাপত্র নিয়ে পালিয়েছি। সুনাম বটে। কাগজপত্রগুলি যদি সরাতাম বা সব দেখে রাখতাম তাহলে হয়ত আমাদের অনেক কাজে লাগত। কিন্তু রাজনীতিতে মোহ আমার কোনদিনই ছিল না। জাপানী পুলিসে ধরে নিয়েছে আমি সব জানি এবং হয়ত বা কিছু কাগজপত্র চীনা গভর্ণমেণ্টকেও দিয়ে দিয়েছি। অথচ আসলে আমি কিছুই জানিনা। পিপিঙ, হঙকঙ সাংহাই ইত্যাদি অনেক জায়গা হতেই চিঠিপত্র আসত এই মাত্র জানি।'

লাওপেঙ বলল—'লিয়াঙের দলের সকলেই তোমার নাম জানে এবং অনেকে চেনেও। হয়ত বা আমাদের লোকেও সুই মালিনকে বিশ্বাসঘাতকদের দলে ধরে রেখেছে। তারাও তোমায় পেলে ছাড়বে না। তুমি খুবই ছেলেমানুষী করেছ, বোকার মত কাজ করেছ—'

'আমি তখন একথা ভেবে দেখিনি। তাদেরকে আমি ঠিকানা দিয়েছিলাম কিন্তু পরে বুঝেছি তাদের কাছে বলা উচিত ছিল আমার আমিই সুই মালিন। এখন আমি কি করে আমার কথা তাদের বুঝাব। তারপর আজকের ব্যাপারটা হচ্ছে যে বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে খেয়াল হল সেই পুরানো বাড়ীটার অবস্থা কি দেখে আসি। বাইরে থেকে তাকিয়ে দেখলাম ঘরটি অন্ধকার। হয়ত বোমার হিড়িকে এখানে যারা

ছিল পালিয়েছে। ফিরবার সময় দেখলাম অন্ধকার থেকে একজন লোক আমাকে লক্ষ্য করছে। আমার ভীষণ ভয় করল—আমি উর্দ্ধশ্বাসে এসে সদর রাস্তায় পড়লাম।···আচ্ছা পেঙ কাকা—আমার এসব কথা পোয়া কি বুঝবে বা বিশ্বাস করবে? আমি তাকে আমার বিয়ের কথাটুকু বলেছিলাম আর কিছুই বলি নি—সেও পীড়াপীড়ি করে নি।'

'পোয়া বুদ্ধিমান, উদার হৃদয়—সে তোমায় ভুল বুঝবে না। আমিও তাকে সব বলব, তোমার কোন ভাবনা নেই।' লাওপেঙ সান্ত্বনার স্বরে বলল।—'কিন্তু তোমার ঐ সুই মালিন নাম আর চলবে না। এখন থেকে তুমি আর মালিন নও। এমন কি আমার কাছে বা পোয়ার কাছেও নয়। মালিন মরে গিয়েছে, হয়ত বা আত্মহত্যা করেছে। তুমি এখন মিস্ পেঙ—আমার ভাইঝি, তোমার বাবা আমার ভাই—তোমার বয়স যখন দশ বছর তখন মারা গিয়েছে। তোমার নাম তা হলে কি হবে স্থির করে ফেল।'

মালিন দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

'না, না, তোমায় আঘাত দেবার জন্য আমি বলি নি···এখন এ ছাড়া উপায় নেই।' লাওপেঙ সস্নেহে মালিনের মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

'আপনি স্থির করে দিন পেঙ কাকা।'

মালিন একবার 'লায়েনারা'র কথা ভাবল কিন্তু আবার মনে হল না সে নাম তার ও পোয়ার মধ্যে—অন্যত্র নয়।

লাওপেঙ একটু ভেবে বলল—'আচ্ছা তোমার কাণের পাশে যে জড়ুলটা আছে তার রঙ কতকটা ট্যান—সেই হিসাবেই আমি তোমার নাম দিলাম 'টানি।'

নামটা মালিনের পছন্দ হল। পরদিন যুমিকেও বলে দেওয়া হল—সে যেন মালিনকে টানি বলে ডাকে। পাঁচদিন পরে তারা যখন সাংহাই-এ পৌঁছাল তখন মালিন আর মালিন নয়—টানি, লাওপেঙের ভাইঝি।

॥ ১০ ॥

পরদিন সকালেই পোয়া উঠেছে। তার মন তখনও মালিনের কথায় ভরপুর। 'কাল আবার দেখা হবে' কথাটার রেশ তখনও যেন কানে বাজছে। মালিনের হাতের স্পর্শ তখনও যেন হাতের মধ্যে লেগে আছে।···হঠাৎ মনে হল সকালে মালিনের সোয়েটার ও গরম পোষাক নিয়ে যাবার কথা আছে। লোলার ঘরে গিয়ে সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে গেটের কাছে আসতেই লাওপেঙের চাকরের সঙ্গে দেখা। চাকরটির কাঁধে মালিনের কম্বলটি। বৃদ্ধ চাকরটি ধীরে ধীরে বলল—'তাঁরা চলে গেছেন।'

পোয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কারা চলে গেছেন?'

'আমার মনিব এবং সেই মহিলাটি। এই কম্বলটি আপনার কাছে নিয়ে আসতে বললেন,—আরও বলতে বলে দিলেন যে তাঁরা এই সহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।'

পোয়া চাকরটির কাঁধে হাত দিয়ে প্রবল এক ঝাঁকানি দিল। চাকরটি সেই ঝাঁকানির ধাক্কায় পেছিয়ে গেল।

'আমি কি করব বলুন?'

পোয়া রেগে জিজ্ঞাসা করল—'তারা কোন কিছু বলে যায় নি, কোন চিঠিপত্র লিখে যায় নি?'

'হ্যাঁ বলে গেছেন—। আমার মনিব আপনাকে বলতে বলেছেন যে—তাঁরা আপনার সঙ্গে সাংহাই-এ দেখা করবেন।'

'এতক্ষণ বল নি কেন?'

'আপনি আর বলবার ফুরসৎ দিলেন কই? হ্যাঁ, ভাল কথা—তিনি আরও বলেছেন যে কতদিনের জন্য যাচ্ছেন তার ঠিক নেই। এবং

এ কথা তিনি কাউকে বলতে মানা করেছেন।' তারপর ধীরে ধীরে সকালের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল।

সব শুনে পোয়া জিজ্ঞাসা করল—'কোনপথে সাংহাই-এ যাবেন বা সেখানে কোথায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন কিছুই বলেন নি?'

'তা কি করে বলব। আমার হাতে এক'শ ডলারের একখানা নোট দিয়ে বললেন—কবে ফিরব তার ঠিক নেই।' পোয়ার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। চাকরটির কাছ থেকে কম্বলটি না নিয়েই মনে মনে তার মুণ্ডপাত করতে করতে পোয়া ভেতরে ঢুকল। যত ভাবে ততই সব ধোঁয়াটে হয়ে যায়।...মালিনকে নিয়ে লাওপেঙ পালাবে...না তা হতেই পারে না। জগতে একমাত্র লোক এই লাওপেঙ যাকে বিশ্বাস করা যায়। আর মালিন!...না না কি সব মাথামুণ্ডু ভাবছে সে।.. লোলার ঘরের দিকে চলল পোয়া।...খানিকক্ষণ বাদে পোয়ার মাথাটা যেন একটু সুস্থ হল। তার খেয়াল হল লাওপেঙের সঙ্গে গেরিলাদের যোগাযোগ আছে। হয়ত বা কোন বিপদের আশঙ্কা করেই তারা চলে গিয়েছে। কিন্তু একবার জানিয়ে গেলেই তো হত। মালিনের তো একবার দেখা করতে আসা উচিত ছিল। হঠাৎ পোয়া উঠে মালিনের স্যুটকেস এবং জিনিষপত্র নিয়ে সোজা ষ্টেশনের দিকে চলল। যদি ষ্টেশনে দেখা পাওয়া যায়। বৃথা অন্বেষণের পর পোয়া দুপুর বেলায় বাড়ী ফিরল আবার সব জিনিষপত্র নিয়ে। সারাটা দিন পোয়া মন মরা হয়ে কাটাল। পরদিন মালিনের চিঠি পেয়ে যেন খানিকটা স্বস্তি পেল। সাংহাই-এ যাবার জন্যও পোয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল। কাইনান তৈরিই ছিল—কিন্তু লোলা, তান ও সিয়েন সঙ্গে যাবে কিনা স্থির করতে আরও ক'দিন দেরি হয়ে গেল। এদিকে মালিন চলে যাওয়ার পাঁচদিন বাদে পুলিস মালিনের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এসে হাজির। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এবং টিয়েনৎসিনের সদর পুলিস অফিসের টেলিগ্রাম পোয়া দেখল। তাতে লেখা ছিল

টিয়েনৎসিনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপপত্নী সুই মালিন তার প্রভুর মূল্যবান অলঙ্কারাদি এবং টাকা পয়সা নিয়ে ১৪ই আগষ্ট থেকে পলাতক হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে সে পিপিঙে প্রিন্সেস গার্ডেনে আও পরিবারের সঙ্গে বাস করছে। তাকে যত শীঘ্র সম্ভব গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য হাজির করা হোক।'

পোয়া পুলিসদের বলল—'বোধ হয় আপনাদের ভুল হয়েছে। এখানে মিস সুই নামে একজন মহিলা ছিলেন কিন্তু চার পাঁচ দিন আগে তিনি এখান থেকে চলে গিয়েছেন। আপনারা ইচ্ছে করলে খানাতল্লাসী করতে পারেন।'

পুলিস খানাতল্লাসী করে মালিনকে না পেয়ে টিয়েনৎসিনে সদর অফিসে লিখল—যে সংবাদ টিয়েনৎসিন অফিসে পৌঁছেছে তা ভুল এখানে ও নামে কেউ নেই।

পোয়ার বুঝতে বাকী ছিল না যে মালিন অতীতের কোন জটিল ব্যাপারে জড়িত। জাপানী অফিসারটির কাছে নাম বলাতে কেন সে ভীত হয়ে পড়েছিল এখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। হয়ত বা ঐ একই কারণে সে লাওপেঙের সঙ্গেও পালিয়েছে।—তবে চুরির অভিযোগ? না—প্রমাণ সাপেক্ষ গুরুতর অভিযোগের অভাব হলে পুলিস মাঝে মাঝে ঐ রকম একটা কিছু করে থাকে।

কিন্তু পোয়ার বাড়ীতে হুলুস্থুল কাণ্ড। সবাই মালিন সম্বন্ধে নানা রকম বাস্তব অবাস্তব কল্পনা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। অনেকেই তার চরিত্র নিয়েও কথাবার্ত্তা বলতে লাগল। শুধু লোলা আর পোয়া চুপ করেই থাকল।

এদিকে ষ্টীমারে যায়গা পাওয়া যায় না। পোয়ার বেরুতে শুধুই দেরী হতে লাগল। প্রায় দু' সপ্তাহ পরে পোয়া সস্ত্রীক সাংহাই-এ গিয়ে পৌঁছাল।

এই সময়ে জাপানীরা সাংঘাতিক ভাবে আক্রমণ সুরু করেছে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে টাঙ্গাঙ প্রদেশ। এখানে চীনাদের অবরোধ ভাঙ্গতে পারলে জাপাই ও কিয়াঙ্‌ওয়ান প্রদেশের সঙ্গে চীনাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। চীনাদের সেনানায়কও ঐ অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন। যুদ্ধের পরিস্থিতি খুবই জটিল। এমনি সময়ে লাওপেঙ টানি ও যুমি এসে সাংহাই-এ পৌছাল।

টানিকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে এজন্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে এডেওয়ার্ড দি সেভেন্‌থ্‌ এভিনিউতে একটা সরাইখানায় তারা একটী ঘর ভাড়া নিল। জায়গা পাওয়াই কঠিন, একখানা ঘরেই তাদের সকলকে থাকতে হবে। পরদিন তারা সাঙকো হোটেলে পোয়ার সংবাদ জানবার জন্য পোয়ার কাকা আফেই এর কাছে গেল। লাওপেঙ নিজের পরিচয় দিতে তারা তাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পোয়ার বাড়ীর অনেক খবরই টানির জানা ছিল তাই অনেকক্ষণ গল্প করে কাটল তাদের। ফিরবার সময় লাওপেঙ আফেইকে তার ঠিকানা দিয়ে বলে দিল পোয়া ছাড়া যেন কেউ ঐ ঠিকানা জানতে না পারে। তারপর তারা হোটেলে ফিরে এল।

আন্তর্জাতিক শাসনাধীন বলে সাংহাই এ যত আশ্রয়প্রার্থীর ভিড়। টাঙ্গাঙে জাপানীরা ঢুকে পড়েছে। যেসব লোক ঐখানকার যুদ্ধের ফলাফলের দিকে চেয়ে বসেছিল তারাও দলে দলে পালিয়ে এসে এই সহরে উঠছে। রাস্তায় দলে দলে আশ্রয়প্রার্থী ঘুরছে আশ্রয়ের আশায়। লাওপেঙ অবস্থাটা দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। থিয়েটার বায়স্কোপ হল এবং অনান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বাড়ীগুলি আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে পরিণত করা হয়েছে। লোকের দুরবস্থা চরমে উঠেছে। টানি ও যুমি বাইরে বেশী ঘোরে নি কিন্তু জানালায় দাঁড়িয়ে যেটুকু দেখতে পেল তাতেই হতবাক। লাওপেঙ ঘুরে এসে বাইরের অবস্থার কথা বলল—একটি

মেয়ে তিনটি ছোট ছোট ছেলে নিয়ে অনাহারে পড়ে আছে মরণোন্মুখ অবস্থায়। কোনরকম সাহায্য করাও কঠিন। যাদের গায়ে জোর আছে তারাই কেড়ে নিচ্ছে। যাই হোক্ কিছু খাবার নিয়ে লাওপেঙ সেই মেয়েটির উদ্দেশ্যে গেল। তাকে খাবার দেওয়া মাত্র অন্যান্য লোকে চুরি করে ও কেড়ে নিতে লাগল তা। সামান্য কিছুমাত্র সে পেল। এভাবে তাকে খাওয়ান কঠিন। পরদিন টানি সেই মেয়েটিকে ডেকে হোটেলের ভেতরে নিয়ে এসে তাকে খেতে দিল। খেতেও যেন তার কষ্ট হচ্ছে—না খেতে পেয়েই তার এই অবস্থা। খাওয়া হয়ে গেলে—তাকে গিয়ে ছেলে তিনটিকে পাঠিয়ে দিতে বলা হল। ছেলে তিনটিও এসে খেয়ে গেল। এই ভাবে তারা রোজই এদের খাইয়ে যেতে লাগল।

সাতদিন কেটে গেল, পোয়া তখনও এসে পৌছয় নি। টানি অধীর হয়ে উঠেছে। লাওপেঙ আফেই-এর কাছে গিয়ে তাকে একখানা টেলিগ্রাম করতে বলল। টেলিগ্রাম করবার চারদিন বাদে উত্তর এল যে পোয়া এবং তার বৌ ৭ই নভেম্বর পিপিঙ হতে রওনা হবে এবং খুব সম্ভব ১২ই কি ১৩ই নাগাদ্ এসে সাংহাইএ পৌছাবে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের মোড ঘুরে গিয়েছে। চীনা সৈন্যরা সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করছে। সারা চাপাই শহরটা তারা জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে। যুদ্ধের বেগ এখন গিয়ে পড়েছে পশ্চিমদিকে। জাপানীরা লাঙ্‌কিয়াঙ্‌এর দিকে এগুচ্ছে। টাই হ্রদের পাশে পঁচাশি মাইল ব্যাপী সৈন্য সমাবেশ না করতে পারলে চীনাদের সমূহ বিপদ। নানকিং এর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। লাওপেঙ মহা দুর্ভাবনায় পড়ল। পোয়ার জন্য অপেক্ষা করতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে যদি জাপানীরা এগিয়ে পড়ে তা হলে দেশের অভ্যন্তরে যাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

বিকেলে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল। লাওপেঙ আগেই বেরিয়েছিল। একটা

বৌদ্ধমন্দিরে বহু আহত সৈন্য আনা হয়েছিল। লাওপেঙ সেখানে গিয়েছিল তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে। ফিরবার পথে একেবারে ভিজে গেল। ফিরতেই টানি তার জামাকাপড় ছাড়িয়ে তাকে বিছানায় শুয়ে পড়তে বলল। লাওপেঙের শরীর সম্বন্ধীয় ব্যাপারে টানি শাসনের ভঙ্গিতেই বলে—আর পেঙ কোন দিনই তাকে মানতে চায় না। আজ কিন্তু সুবোধ বালকের মত লাওপেঙ শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে আপন মনেই লাওপেঙ বলল—'এই বাদলাটা কেটে গেলেই আমায় সাংহাই হতে চলে যেতে হবে।'

টানি কথাটা শুনছিল। একটু অবাক্ হয়েই জিজ্ঞাসা করল—'কেন? আপনি পোয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন না?'

টানির মনের ভাব বুঝতে লাওপেঙের দেরী হল না। ধীরে ধীরে বলল—'তুমি এখানে থাক। আমায় যেতেই হবে। অনর্থক এখানে থাকতে গেলে গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাবার আগে আমি আফেইকে বলে যাব। পোয়া এলেই তোমায় খবর দেবে। যুমিও তোমার কাছেই থাকবে। তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। হাঙকোতে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

টানি জানত একমাত্র তারজন্যই লাওপেঙকে সাংহাইএ আসতে হয়েছে। আর কিছু বলতে তার লজ্জা হল।

অর্দ্ধেক রাত্রিতে ছারপোকার কামড়ে উদ্ব্যস্ত হয়ে টানি উঠে টর্চলাইটটা খোঁজ করছিল। লাওপেঙের ঘুম খুব পাতলা। ঐ শব্দেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। টানি এই ভয়েই ঘরের আলো জ্বালতে চায়নি।

'বড্ড ছারপোকা—তাই টর্চটা খুঁজছি।'

'টর্চে খুঁজে পাবে না, আলো জ্বালো।'

'আপনার অসুবিধে হবে...।'

'অসুবিধে হবে না—তাছাড়া ঘুমতো ভেঙ্গেই গিয়েছে।'

টানি উঠে গাউনটা জড়িয়ে নিয়ে আলো জ্বেলে সোফার ওপর বসল। বলল—'আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

'আচ্ছা তা হবে আগে ঢাকা দিয়ে নাও, তা না হলে ঠাণ্ডা লাগবে।'

'সোফার ওপর শুলে মন্দ হয় না।' এই বলে সে বিছানা পত্র নিয়ে সোফার ওপর শোবার যোগাড় করতে লাগল। যূমির ঘুম ভেঙ্গে যেতে সে জিজ্ঞাসা করল—'কি ব্যাপার?'

'কিছু না। ওখানে বড্ড ছারপোকা, আমি সোফার ওপর শোব। তুমি ঘুমাও।'

'সোফার ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে টানি বলল—'আপনি পোয়ার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবেন···কিন্তু আপনি বলেছিলেন পোয়াকে আমার কথা বুঝিয়ে বলবেন···।'

'হ্যাঁ, ইতিমধ্যে হাঙকোর রেলপথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সেদিক দিয়ে যাওয়া আর সম্ভবপর নয়। আরও দেরী করা মানে আরও অসুবিধের সৃষ্টি করা—। পোয়াকে বলবার ইচ্ছে আমার ছিল কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল।···আমাকে যে ভাবে সব কথা গুছিয়ে বলেছ তাকেও সেই ভাবে বল। আমার মনে হয় তুমি গুছিয়ে বলতে পারবে। পোয়াকে আমি চিনি, সে ভুল বুঝবে না।···আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'করুন।'

'আমি ভাল ভাবেই লক্ষ্য করেছি পোয়ার সঙ্গে তোমার বেশ খাপ খাবে। ধর তোমরা দুজনে একত্র হলে—তারপর তুমি কি করবে স্থির করেছ?'

'আমি কোন দিন সে কথা ভাবি নি।'

'পোয়া বড়লোক। যুদ্ধে আহত, গৃহহীন, বিত্তহীন পলাতক আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য সে যদি অর্থ ব্যয় করে তা হলে কি তুমি অনুমোদন করবে?'

'নিশ্চয়ই করব। এতদিন তো স্বার্থপরের মতই কাটিয়েছি, সে সুযোগ কোনদিনই পাই নি। কিন্তু আপনার কি ধারণা এবিষয়ে পোয়াকে আমি অনুপ্রেরিত করতে পারব?'

'আমার ধারণা পারবে। তার টাকা পয়সার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে আমি তোমার উপরেই ভরসা রাখি। আর বড়লোকের অর্থের একমাত্র সদ্ব্যবহার পরহিতার্থে দান।'

শোন—আমি আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে নদীপথে যাব। আমার ঠিকানা সঠিক কিছু বলতে পারব না এখন। তবে 'চাঙফু-মানি-সপ' এই ঠিকানায় চিঠি দিলেই আমি পাব। যেখানেই থাকি না কেন তারা চিঠি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।...এবার ঘুমোও।'

টানি আলো নিভিয়ে দিয়ে ভাল হয়ে শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ বাদে আবার ডাকল—'পেঙ কাকা।'

'না আর না—এখন ঘুমোও।'

॥ ১১ ॥

টানি ও যুমির সঙ্গে পেঙের কথা হল যে তারা হাঙকোতে সুবিধা মত দেখা করবে। ৮ই নভেম্বর লাওপেঙ নান্‌কিন রওনা হল। ঠিক তারপরের দিনই চীনাসৈন্যরা সাংহাইয়ের পশ্চিম উপকূল থেকে পশ্চাদপসরণ করে আসে। লাওপেঙ চলে যাওয়ায় টানি একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

এক সপ্তাহ পরে পোয়া সস্ত্রীক সাংহাই এসে পৌছাল। পোয়ার ইচ্ছে ছিল কোন হোটেলে সে থাকবে। কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে সকলে ক্ষুণ্ণ হবে এই ভেবে স্থির করল কিছুদিনের জন্য অন্তত শ্বশুরবাড়ী থেকে পরে অন্যত্র ব্যবস্থা করবে।

বিকেলে কাইনানকে সঙ্গে নিয়ে সে তার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে বেরুল। সকলেই পোয়া ও কাইনানকে দেখে খুসী। বিশেষত আফেই কাকার বাড়ীতে তারা বেশ খানিকক্ষণ কাটাল। সেখানে কথাপ্রসঙ্গে আফেই বলল—'তোমার বন্ধু মিষ্টার পেঙকে নিশ্চয়ই মনে আছে ?'

'হ্যাঁ, কোথায় সে ?'

'গত সপ্তাহে তিনি এখানে এসেছিলেন। তিনি তোমায় জানাতে বলে গিয়েছেন যে উপায় থাকতে থাকতে তিনি নানকিন চলে যাবেন। তাঁর ভাইঝিকে এখানে রেখে গিয়েছেন। ঠিকানাটাও দিয়ে গিয়েছেন এবং তার ভাইঝির সঙ্গে তোমায় দেখা করতে বলেছেন। মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়, নাম যতদূর মনে পড়ে বোধহয়—টানি।'

'পেঙের ভাইঝি টানি!' পোয়া একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করল—'টানি! কি রকম দেখতে বলুন তো ?'

চেহারার বর্ণনা শুনে পোয়ার আর বুঝতে বাকী রইল না। সে হেসে বলল—'আমাদের বাড়ীতে ঐ মেয়েটি ছিল। ওর আসল নাম মালিন। জাপানীদের বিরুদ্ধে সে কি রকম জড়িত বলে মনে হয় এবং সেই কারণেই সেখান থেকে পালিয়ে আসে। খুব সম্ভব নামটাও সেই কারণে পাল্টেছে। আমি তার জন্য বিশেষ চিন্তিত আছি। দেখি পেঙ কি অবস্থায় তাকে রেখে গিয়েছে। এখনই আমি সেখানে যাচ্ছি। কাইনানকে যেন বলবেন না আমি কোথায় যাচ্ছি। কাইনান মেয়েটিকে ভাল চোখে দেখে না। আমি এসে এখানে খাব।'

আফেই একটু হাসল।

এদিকে পাশের ঘরে কাইনান বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মালিনের গল্পে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। তার ওপর যখন আবার মিস্ পেঙ বা টানির কথা শুনল তখন তার আর বুঝতে বাকী রইল না যে মালিনই

নাম বদল করেছে। সে মালিনের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার কথা, অতীতে বড়লোকের উপপত্নী হয়ে বাস করা, তার টাকাপয়সা ও গহনাগাটি চুরি করে পালান সবই তাদেরকে বলল। তারা তো শুনে অবাক।

পোয়া সোজা টানির হোটেলে গিয়ে উঠল। কড়া নাড়তেই যুমি দরজা খুলে দিল। পোয়া বলল—'আমি মিস্ পেঙের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তিনি বাইরে গিয়েছেন' বলেই যুমি দরজা বন্ধ করে দিল। পরক্ষণেই আবার দরজা খুলে বলল—'আপনি পেঙ সাহেবের বন্ধু? আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আপনি ভিতরে এসে বসুন। এতদিন তিনি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।'

'তোমাকে তো চিনলাম না?'

'আমি মিস্ পেঙের সঙ্গে এখানে থাকি। আমার নাম যুমি। মিস্ পেঙ আপনাকে দেখে খুবই আনন্দিত হবেন।'

'সে কোথায়?'

'বেড়াতে বেরিয়েছেন।'

যুমি পোয়াকে চা ও সিগারেট দিল। পোয়া কিন্তু যুমিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। শুধু এইটুকু বুঝল যে যুমি একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। পোয়া জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কতদিন হতে তার সঙ্গে আছ?'

'আমরা পিপিঙ থেকে একসঙ্গে এসেছি। আপনিও কি পিপিঙ থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি পেঙ সাহেবের আত্মীয়?'

'না—কেন?' পোয়ার বেশ মজা লাগছিল এই মেয়েটির প্রশ্নে।

'আপনার জন্যই তো মিস্ পেঙকে তিনি এখানে নিয়ে এসেছেন?'

'সে ধারণা তোমার কি করে হল?'

'মিস্ পেঙ বলেছেন যে মিষ্টার পেঙ তাঁর কেউ হন না—তাই। এখানে আসবার পর থেকে মিস্ পেঙ আপনার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন। এতদিন ভাবতাম—না জানি তিনি কে যার সঙ্গে মিস্ পেঙের বিয়ে হবে।'

'হুঁ, তুমি নিশ্চয়ই খুব হতাশ হয়েছ?'

'না, না, আপনাদের দু'জনকে বেশ মানাবে। আপনার সঙ্গে মিস্ পেঙের যদি বিয়ে হয় তা হলে বলতে হবে তার কপাল ভাল। শুনেছি আপনি খুব বড়লোক, বিরাট বাড়ী, বাগান…।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই তো। বিয়ে কবে হবে?'

পোয়ার আর এসব প্রসঙ্গ ভাল লাগছিল না। এমন সময় টানির পায়ের শব্দ শুনে যুমি দরজা খুলে দিল। পোয়াকে দেখেই টানি কেঁদে ফেলল। পোয়া তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। যুমির উপস্থিতির কথা ভুলে গেল তারা। যুমি একটু সলজ্জ হাসি হাসল। আবেগ একটু কমলে পোয়া জিজ্ঞাসা করল—'এ মেয়েটি কে?'

'একজন আশ্রয়প্রার্থী, পিপিঙের পশ্চিম পাহাড়ে এর সঙ্গে আমার আলাপ।'

পোয়াকে টেনে সোফার পাশে বসিয়ে টানি বলল—'উঃ কতদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করছি!…আর কিছুদিন দেরী হলে হয়ত মরেই যেতাম…। কোথায় উঠেছ?'

'শ্বশুর বাড়ী।'

যুমি অবাক্ হয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করতেই পোয়া তার দিকে চাইল। টানি হেসে তাকে একটু বাইরে যেতে বলল। যুমি লজ্জিত ও হতাশ হয়ে বেরিয়ে গেল।

'…হ্যাঁ ভালকথা—লাওপেঙের সংবাদ কি?'

'তিনি সপ্তাহখানেক আগে নানকিন্ গিয়েছেন।...যাক—তার কথায় কোন প্রয়োজন এখন নেই। এখন অন্য কারও প্রয়োজন নেই—শুধু আমাদের কথা।...পেঙকাকা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন কি হবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা দু'জনে তার সঙ্গে যাব জনসেবার জন্য, যুদ্ধের জন্য যারা গৃহহারা; অন্নহারা, পরিবার হারা—এককথায় যারা সর্বহারা, তাদের সাহায্য করতে। তিনি তো এসব কথা আগেই তোমায় বলেছেন। আমরা এমন জায়গায় যাব যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। লোকের কথাতে আমাদের কিছু আসবে যাবে না।'

'তুমি বুঝি লাওপেঙের সঙ্গে এইসব ঠিক করে রেখেছ?'

'হ্যাঁ, তিনি বলছিলেন তোমরা দু'জনে এ বিষয়ে কতকটা একমত। তোমার টাকা আছে...এইসব কাজে অর্থব্যয় করবে।'

অপরের মুখে নিজেকে ধনী বলে শুনতে পোয়ার মোটেই ভাল লাগে না। একটু আগেই যূমি ও তার টাকার কথা তুলেছিল। কথার মোড় ঘুরাবার জন্য পোয়া বলল—'আমাদের কথা ছাড়া অন্য কারও কথা হবে না বললে, আবার এই সব কি বাজে কথা আরম্ভ করেছ।'

'বাজে নয়—ভবিষ্যতে আমরা কি ভাবে চলব তাই তো বলছি। তোমার এতে মত নেই?'

'মত আছে...কিন্তু তুমি বহুদূরের জিনিষ নিয়ে টানাটানি করছ। ভবিষ্যৎ অত সরল নয়।...আচ্ছা লায়েনারা হঠাৎ তুমি নাম বদলালে কেন?'

'নিজের নিরাপত্তার জন্য। তুমি তো জানই জাপানীদের সম্বন্ধে আমি একটু বেশী মাত্রায় ভীত।'

'আমি সেই কথাই জানতে চাই। সমস্ত ব্যাপারটা কি খুলে বল।'

টানির শরীরে যেন একটা শিহরণ এল। এই হচ্ছে তার চরম মুহূর্ত।

'আচ্ছা লায়েনারা! তুমি কি কারও উপপত্নী হয়ে বাস করতে?'

একটু ইতস্তত করে টানি উত্তর দিল—'হ্যাঁ।'

'তুমি কি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলে? পুলিসের পরোয়ানায় দেখলাম যে টাকাপয়সা ও গহনাপত্র নিয়ে তুমি পালিয়েছিলে?'

টানি ভীষণ ভাবে প্রতিবাদ করে উঠল—'কখ্খনও নয়। আমার সম্বন্ধে তুমি ঐ কথা বিশ্বাস করলে?'

'আমি একবর্ণও বিশ্বাস করি নি।'

'না বিশ্বাস কর নি—'এই বলেই টানি কেঁদে ফেলল। 'হ্যাঁ—হ্যাঁ বিশ্বাস কর নি। আমি পালিয়েছিলাম, রক্ষিতা হয়ে বাস করতাম··· আমি আগেই একদিন বলেছিলাম যে মেয়েরা যা করে সবই অন্যায়—আজ বুঝছো নিশ্চয়ই। আমি আগেই চেয়েছিলাম তোমাকে সব কথা খুলে বলব কিন্তু হয়ে ওঠে নি।'

এ অবস্থায় যুক্তি তর্ক দিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করা বৃথা। কাজেই পোয়া টানিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে বলল—'তুমি বিশ্বাস কর ওসব আমি এক বর্ণও বিশ্বাস করি নি।'

টানি কতকটা শান্ত হয়েছিল। সে প্রশ্ন করল—'এ সব তুমি কি করে জানলে?'

'সেই কথাই তো আমি বলতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু তুমি আর সে সুযোগ দিলে কই?' এই বলে পোয়া টানি চলে আসার পর পুলিসের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার কথা আনুপূর্বিক বলল। সমস্ত শুনে টানি বলল—'যা শুনেছ তাত শুনেছই। আরও অনেক কথা আছে বলছি।'

'যাক্ সে কথা পরে বললেও হবে।'

'কেন সে সব কথাতে তোমার কিছু আসে যায় না?'

'না।'

'পোয়া আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম তাই এত বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। না—আমি এখনই তোমায় বলব।' এই বলে টানি লাওপেঙকে যে সব কথা বলেছিল সব পোয়াকেও বলল। কিছুক্ষণ পরে পোয়া উঠল আফেই-এর বাড়ীতে যাবার জন্য—সেখানে খাবার কথা আছে।

পোয়া চলে গেলে খানিক বাদে যুমি ফিরল। টানিকে দেখে সে বলল—'মনে হচ্ছে তুমি একচোট কেঁদেছ?'

'ও কিছু নয়। অনেকদিন বাদে দেখা…।'

'আচ্ছা উনি কি বিবাহিত?'

'…হ্যাঁ—তবে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তুমি বলবে যে ও সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না।'

'আচ্ছা।'

'কিছুক্ষণ বাদে পোয়া ফিরে এসে টানিকে নিয়ে বেরুল। বেরোবার মুখে যুমি জিজ্ঞাসা করল—'কোথায় যাচ্ছ?'

টানি হেসে উত্তর দিল—'তুমি ওভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। খাওয়া সেরে নাও—আমি পরে ফিরব।'

যুমি একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল।

পোয়া টানিকে অন্য একটা হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল।…সে যখন ফিরল তখন রাত দশটা। তার চোখে মুখে অদ্ভুত এক তৃপ্তির ভাব। সে তৃপ্তি প্রেমের পরিপূর্ণতা ও নিঃশেষে পাওয়া ও দেওয়া ছাড়া আসে না। এই হচ্ছে প্রেমের স্বভাবসিদ্ধ পরিণতি। টানির মুখের সে ভাব যুমির চোখ এড়াল না। পরদিন সকালে টানি যখন উঠল তখন তার মুখে একটা অশান্তির ছাপ—চোখে মুখে যেন কিসের একটা তৃষ্ণা, কিসের একটা আকাঙ্ক্ষা। আজ টানির মনে হচ্ছে যেন নিজের অনেকখানিই সে হারিয়ে ফেলেছে।—যেটা এতদিন তার নিজেরই ছিল।

পরের দিনগুলি টানি ও পোয়ার বেশ ভালভাবেই কাটছিল। টানির হোটেলের ঠিকানা পোয়ার আত্মীয় স্বজনেরা সকলেই জানত তাই পোয়ার কথামত টানি অন্য একটা হোটেলে গেল। পোয়াও নিকটেই অন্য একটা হোটেলে একখানা ঘর নিল। টানির ঘরে যুমি থাকায় তাদের মিলনের অসুবিধা হত বলে অধিকাংশ দিন সন্ধ্যাবেলায় টানি পোয়ার ঘরেই কাটাত। পোয়া নানাবিধ মূল্যবান পোষাক গহনাপত্র উপহার দিতে লাগল টানিকে। বেশ আমোদ আহ্লাদেই তাদের দিনগুলি কাটতে লাগল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে টানি লাওপেঙের কথা তুলল। কি রকম আগ্রহ ও যত্নের সঙ্গে লাওপেঙ আশ্রয়প্রার্থীদের সেবা করত উচ্ছ্বসিত ভাবে টানি তার বর্ণনা দিয়ে বলতে লাগল।

পোয়া অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল—'তাই বলে যে আমিও লাওপেঙের মত আশ্রয়প্রার্থীদের আমার যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দেব এটা আশা করতে পার না। লাওপেঙ আমার বন্ধু, আমি তাকে ভালবাসি, তবুও তোমায় বলে দিচ্ছি যখন তখন তার প্রসঙ্গ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে পাবে না।'

কথাটা টানিকে একটু আঘাত করল। নিজেকে তার হেয় মনে হতে লাগল। এও কি সেই পুরানো জীবন,—উপপত্নীর জীবন!

মাঝে টানি একদিন জেদ ধরল পোয়ার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা করবে। পোয়া প্রথমে আপত্তি জানাল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে রাজি হতে হল। সেখানে যেয়ে টানি বুঝল তার না আসাই ভাল ছিল। বাড়ীর আবহাওয়া যেন বদলে গেছে। পোয়া খেয়াল করে নি কিন্তু টানির চোখ এড়ায় নি। টানির মনটা খারাপ হয়ে গেল। একদিন পোয়া টানিকে বলল—'তোমার কি হয়েছে বলতো? তুমি কেমন যেন মনমরা হয়ে থাক?'

টানি উত্তর দিল—'কিছুই না।'

পোয়া টানিকে নিয়ে সে দিন এক নাইট ক্লাবে গেল। নাইট্ ক্লাবে এলে কে বলবে যে দেশে যুদ্ধ চলছে,—লোকে না খেয়ে মরছে। এখানকার গৃহ-সজ্জা, জাঁকজমক, লোকের ভিড় দেখলে মনে হয় যেন দেশে কোন কিছুরই অভাব নেই। টাকার ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে এখানে। নাচ আরম্ভ হলে পোয়া এবং টানিও নাচতে গেল। নাচবার সময় পোয়া লক্ষ্য করল টানি একটি মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে। নাচ শেষ হতে মেয়েটি এসে তাদের পাশেই বসল। তার মুখখানা বেশ ভরাট, পরনে সাদা পোষাক—বয়স টানির চেয়ে কিছু বেশীই হবে। জিজ্ঞাসা করতে টানি পোয়াকে বলল—'ও আমার পুরানো বন্ধু। টিয়েনৎসিনে যখন নর্তকীর কাজ করতাম তখন ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়।'

পোয়ার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিল টানি। মেয়েটির নাম মিস্ সিয়াংগিয়ান। টানি তাকে খাবার অনুরোধ করল তাদের সঙ্গে। পোয়া লক্ষ্য করল তার হাব,-ভাব, কথা, পোষাক—সবকিছু দেখে মনে হয় একটু সেকেলে সমাজের মেয়ে সে। বয়স অনুমান বত্রিশ—পরিপূর্ণ নারীত্বের প্রকাশ তার সর্বাঙ্গে। পারিপাট্যের দিকে বেশ লক্ষ্য আছে। গলার স্বরে একটু কর্কশ ও জড়তার ভাব—হয়ত অনেক দিনের অনিদ্রার ফলেই এসেছে। মেয়েটির সম্বন্ধে পোয়ার একটু কৌতূহল হল। সিয়াংগিয়ানের জন্য একখানা দশ ডলারের টিকিট নিয়ে পোয়া ও টানি তাকে সঙ্গে করে হোটেলে ফিরল। সিয়াংগিয়ান মালিনকে মালিন বলে ডাকতেই ওরা তাকে বলে দিল যে মালিনের নাম বদলে টানি করা হয়েছে। সিয়াংগিয়ান চুপি চুপি টানিকে জিজ্ঞাসা করল যে সাংহাই-এ তার পালানর কথা যা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল তা সত্যি কিনা? টানি জানাল যে পালানর খবরটুকুই মাত্র সত্যি বাকীটা মিথ্যে।

নানাপ্রকার আলোচনা প্রসঙ্গে সিয়াংগিয়ান আজকালকার মেয়েদের প্রসঙ্গ তুলল। তার বক্তব্য হচ্ছে—আজকাল ঘরের বউ-ঝি এবং স্কুল

কলেজের মেয়েরা পেশাদার মেয়ে যেমন নর্তকী, পতিতা, রক্ষিতা প্রভৃতির সঙ্গে সমান ভাবে পাল্লা দিচ্ছে। আগে কোন ভদ্রঘরের মেয়েদের নাইট ক্লাবে আসতে মাথা কাটা যেত কিন্তু আজকাল দলে দলে তারা আসে এখানে। ফলে পেশাদার মেয়েদের দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েছে। অধিকাংশ যুবক ছাত্রীদের এবং ভদ্রঘরের বউঝিদের নিয়েই ব্যস্ত।

পোয়া হেসে জিজ্ঞাসা করল—'তাতে আপত্তি কি ?'

'আপত্তি অবশ্য বিশেষ কিছুই নেই। কিন্তু দেখুন—তাতে সমাজের লাভ কিছু হচ্ছে না—বরং লোকসানই হচ্ছে। আজকাল মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না। এমন কি বড়লোকের ঘরের মেয়েদেরও পাত্র জুটছে না। আগে কোন মেয়ের সঙ্গে কোন ছেলের একটা কিছু ঘটলে তাদের বিয়ে করতে হত—কিন্তু আজকাল ?' বলতে বলতে সিয়াংগিয়ান হাসল, পোয়াও হাসল। গল্পগুজব করতে করতে রাত প্রায় এগারটা বাজলে সিয়াংগিয়ান উঠল। যাবার আগে টানিকে তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল সে। টানির ঠিকানা জেনে নিয়ে সিয়াংগিয়ান চলে গেলে পোয়া টানিকে বলল—'তোমার ঠিকানাটা না দিলেই ভাল করতে।'

'তা হোক ওকে বলায় কোন ক্ষতি হবে না'—টানি উত্তর দিল।

এমন সময় টানি হঠাৎ দু'টুকরো সিল্কের কাপড় বের করে বলল—'পোয়া, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, এক সঙ্গে বাস করতে চাই। সেক্ষেত্রে আমরা যদি লিখিত ভাবে কোন অঙ্গীকার করি তাতে তোমার আপত্তি হবে না নিশ্চয়ই ?'

পোয়া এটা ঠিক ভাবতেই পারে নি। মালিন বলল—'এই দুখানা কাপড়ে আমরা লিখে রাখব যে চিরকাল আমরা পরস্পর ভালবাসব। একখানা তোমার কাছে থাকবে, আর একখানা থাকবে আমার কাছে। আমার জীবনে এই হবে অমূল্য রত্ন।'

দুজনেই লিখল—প্রথমে নাম, জন্ম তারিখ তারপর তাদের অঙ্গীকার লিপি। অবশেষে স্বাক্ষর করলে দুজনে।

পোয়া বলল—'কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠিক পাকাপাকি হল না, একজন সাক্ষী দরকার।' যুমির নাম প্রস্তাব করল টানি। পোয়া আপত্তি করে বলল—, 'না, একজন উকিল দরকার। দু'একদিনের মধ্যেই আমি একজন উকিল নিয়ে আসব।' এর পরে টানি বিদায় নিয়ে নিজের হোটেলে ফিরে গেল।

সে রাত্রে পোয়া যখন শ্বশুরালয়ে ফিরল কাইনান তখনও শোয় নি। পোয়া ঘরে ঢুকতেই সে বলল—'আজ বুঝি মদ খেয়েছ, গন্ধ বেরুচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'আবার মেয়ে মানুষের সঙ্গে…?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ভেবেছিলাম অন্তত আমার বাপের বাড়ীতে এসে তুমি একটু সামলে চলবে।'

পোয়া আর কোন কথা না বলে পোষাক ছাড়তে আরম্ভ করল।

কাইনান আবার জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কোন হোটেলে আছ?'

পোয়া উত্তর দিল—'তোমার জানবার প্রয়োজন নেই।'

'আজ একটি লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তোমার ঠিকানা জানতে চাইল দেখা করবার জন্যে। কিন্তু ঠিকানা জানা না থাকায় তাকে বলতে পারি নি। আমার মা ভেবেছিলেন যে অন্তত আমি জানি তোমার ঠিকানা। এই কি যথেষ্ট নয়?'

'লোকটি কি জন্য দেখা করতে এসেছিল?'

'কিছু বলে নি, আবার আসবে।'

বাক্যালাপ এখানেই শেষ হল। কাইনানের দিকে চাইতে পোয়া

বুঝল তার চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে রয়েছে। সে বলল—'তুমি আজও সেই পুরানো ব্যাপার নিয়ে সারাদিন কেঁদেছ ?'

কাইনান কোন উত্তর দিল না এ প্রশ্নের।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে পোয়া বেরিয়ে পড়ল। একজন উকিল জোগাড় করে টানির কাছে নিয়ে যেতে হবে। যাবার সময় কাইনানকে বলে গেল যে সারাদিন সে নাও ফিরতে পারে, কাজ আছে।

রাস্তায় বেরিয়েই পোয়া একজন বেশ গাট্টাগোট্টা ধরণের লোককে দেখল। লোকটির গায়ে একটা ঢিলে পোষাক। কাছেই একটা নতুন মটরগাড়ী, ড্রাইভার বসে আছে গাড়ীতে। লোকটি পোয়ার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—'আপনিই কি মিষ্টার আও ?'

পোয়া ঘাড় নাড়ল।

'মিষ্টার টাঙ, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'মিষ্টার টাঙ কে ?'

'যদি কিছু মনে না করেন তো গাড়ীতেই আসুন না।'

পোয়ার মনে হল বোধ হয় তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাই সে একটু ইতস্তত করছিল। ইতিমধ্যে লোকটি খপ করে তার হাত ধরে বলল—'ভয়ের কোন কারণ নেই। আমাদের দলপতি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন বিশেষ কোন বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য।'

পোয়া বুঝল যে সহজে ছাড়া পাওয়া যাবে না। আর কোন রকম আপত্তি না করে সে গাড়ীতে উঠে পড়ল।

পোয়া লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল—'ব্যাপার কি ?'

'মিষ্টার টাঙের সঙ্গে দেখা হলেই আপনি বুঝবেন। আপনার জন্যই তিনি এই গাড়ী পাঠিয়েছেন। আমরা তাঁর আদেশ মেনে চলি মাত্র।'

একটা বিরাট বাগান বাড়ীর মধ্যে গাড়ীটা ঢুকল। এতক্ষণে পোয়ার ভয় অনেকটা কমে এসেছে। তার খেয়াল হয়েছে মিষ্টার

টাঙের নাম সে এর আগেও শুনেছে। চীনের এক বিখ্যাত গুপ্ত সমিতির নেতা তিনি। পোয়ার ধারণা হল যে হয়ত মিষ্টার টাঙ তার সাংহাই আসার সংবাদ জানতে পেরে অর্থ সাহায্যের জন্য তাকে এই ভাবে নিয়ে এলেন। একটা ছিপছিপে চেহারার ছোকরা তাকে মিষ্টার টাঙের কাছে নিয়ে গেল। মিষ্টার টাঙ তখন তাঁর অফিস ঘরের দরজাতেই দাঁড়িয়েছিলেন পোয়াকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। তাঁর মুখে হাসি—যেন কতকটা জোর করে টেনে আনা হাসি।

'আপনাকে এভাবে কষ্ট দেবার জন্য সত্যিই আমি খুব লজ্জিত। কিন্তু অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়ে আপনার পরামর্শ আমার দরকার, সেই জন্যই আপনাকে এভাবে কষ্ট দিতে হল।'—অতি ভদ্রভাবে মিষ্টার টাঙ পোয়াকে অভ্যর্থনা করলেন এই কথা বলে।

পোয়া হেসে উত্তর দিল—'আপনার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ যে এভাবে আমার ভাগ্যে আসবে তা আমি ভাবতেই পারি নি। এ আমার সৌভাগ্য।'

একটা চেয়ার দেখিয়ে পোয়াকে বসতে বললেন মিষ্টার টাঙ। তারপর লঘুপদক্ষেপে পাশের ঘরে গিয়ে কাউকে কিছু বলে আবার পোয়ার সামনে এসে বসলেন।

মিষ্টার টাঙ হচ্ছেন ফ্রেঞ্চ মিউনিসিপাল গভর্ণমেণ্টের কাউন্সিলার। তাঁকে ছাড়া সে অঞ্চলে শান্তি রক্ষা করা কঠিন। তাঁর গোপন দল অতি সাংঘাতিক। প্রায় হাজার বছর ধরে চীনে এক গুপ্ত দস্যুদল আছে। দেশের নানাপ্রকার ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময়ে এই দল বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অত্যাচারী শাসককে খুন করা, বড়লোকদের বাড়ীতে ডাকাতি করা, ইত্যাদি কাজ অনেকদিন ধরেই করে আসছে এই দল। ফলে লোকে দলটিকে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এই দলের নেতা হওয়ায় মিষ্টার

টাঙকে সাংহাইএর প্রত্যেকেই ভয় ও ভক্তি করে চলে। এখানে তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অসাধারণ। গভর্ণমেণ্টের কর্ণধাররা অনেকেই তাঁর বন্ধু, এমনকি জেনারেল চিয়াংকাইশেকও তাঁর একজন অন্তরঙ্গ। যুদ্ধ বাধবার পর থেকে মিষ্টার টাঙ দেশের কাজে লেগেছেন। বিশেষ ভাবে বিশ্বাসঘাতকদের দমনে তিনি পুরোপুরি সাহায্য দিচ্ছেন গভর্ণমেন্টকে। এই কাজে তিনি নিজের যথাসর্বস্ব ব্যয়ও করেছেন। তাঁর ধনী বন্ধুবান্ধবরাও অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁকে অর্থ সাহায্য দিচ্ছে এই কাজের জন্য।

মিষ্টার টাঙের সেক্রেটারী এসে এক বাণ্ডিল কাগজ দিয়ে যেতে মিষ্টার টাঙ তাকে দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন।

'একটা ব্যাপারের অনুসন্ধানে আমরা ব্যস্ত।'—এই বলে তিনি পোয়াকে দেখবার জন্য একখানা কাগজ দিলেন। মালিনের আদি বৃত্তান্ত লেখা ছিল কাগজটীতে। তিনি পোয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি তাকে দেখেছেন?'

পোয়া উত্তর দিল—'অবশ্য এ বিষয়ে কিছু শুনেছি আমি।'

মিষ্টার টাঙ বলতে লাগলেন—'মিষ্টার আও, সম্ভবত আপনি আমার কার্যকলাপ সম্বন্ধে শুনেছেন। বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ। আপনি দেশকে ভালবাসেন। আপনার বংশেরও গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। আপনার পিতামহ বিপ্লবের একজন মস্তবড় সহায়ক ছিলেন। দু'সপ্তাহ আগে আমরা এক বিশ্বাসঘাতকের বাড়ীতে চড়াও হই। সেখানে কিছু কাগজপত্র আমাদের হস্তগত হয়। তার মধ্যে টিয়েনৎসিন থেকে লেখা খানকয়েক চিঠি ও টেলিগ্রাম আমাদের হস্তগত হয়। ঐগুলো সবই সুই মালিনের নামের। টিয়েনৎসিন থেকেও আমরা ঐ মর্ম্মে সংবাদ পেয়েছি। মেয়েটার বাসা চড়াও হয়ে বহু কাগজপত্র আমরা হাত করি।

মেয়েটিকে আমরা ধরতে পারিনি। টিয়েনৎসিনের পুলিসের কাছে আমরা জানতে পারি যে মেয়েটা পিপিঙে আপনার বাড়ীতে কিছুদিন বাস করেছিল। খুব সম্ভব সে এখন এখানেই আছে। সে এখন কোথায় আছে জানেন ?'

'না।' কথাটা যেন আপনা আপনিই বেরিয়ে এল পোয়ার মুখ থেকে।

'আপনার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল কিভাবে ?'

'অনেকদিন আগে আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়। সেই সূত্রে সে এসে আমাদের বাড়ীতে বাস করেছিল। অনেকদিন হয়েছে সে আমাদের বাড়ী থেকে চলে গিয়েছে। এখন কোথায় আছে তা আমরা কেউ বলতে পারি না।'

'আচ্ছা এই সব কাগজপত্রগুলি পড়ে দেখুন। মেয়েটি আগে নর্ত্তকী ছিল। আমরা তাকে খুঁজে বার করবই।'

পোয়া বেশ ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেল। মালিন নর্ত্তকী ছিল, রক্ষিতা ছিল, পালিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু সব কিছু সবিশেষ পোয়া জানে না। অথচ এই সব কাগজপত্রে যে অভিযোগের কথা লেখা আছে তা সাংঘাতিক !

'এবারে বুঝেছেন যে মেয়েটিকে আমাদের কেন দরকার ?'

পোয়া বলল—'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে কোন লোক তার নাম দিয়ে এই কাজ করেছে। তাছাড়া জাপানী পুলিশও যখন তাকে ধরতে চায় তখন তাদেরই সহযোগিতা সে করতে পারে কি ?'

'আপনি সেটা ধরে নিচ্ছেন। আমি অবশ্য এইটুকু মানি যে তার ব্যাপারটা একটু জটিল—অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে ভেতরে। এমনও তো হতে পারে যে জাপানীরা তাকে ধরতে চায় কারণ সে অনেক কিছু গোপনীয় বিষয় জানে এবং এখন আত্মগোপন করে

আছে এইজন্যে। আমরাও তো সেইজন্যেই তার খোঁজ করছি। যাই হোক সে সব সাক্ষ্য প্রমাণ সাপেক্ষ। আশা করি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন—তাকে নয়। এখন কথা হচ্ছে—আপনি তাকে আমাদের হাতে দেবেন কিনা?'

ভ্রূ কুঁচকে মিষ্টার টাঙ পোয়ার দিকে তাকিয়েছিলেন। ভিতরে ভিতরে পোয়ার বেশ ভয় হচ্ছিল। তবু হাসির রেশ টেনে পোয়া বলল—'মিষ্টার টাঙ আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুদ্ধ বিশ্বাসঘাতকের পর্যায়ে ফেলছেন না। জানলে আমার বলতে কোনই আপত্তি নেই। সে হঠাৎ আমাদের বাড়ী থেকে চলে যায়, তার সম্বন্ধে আর কোন খোঁজ খবর আমরা রাখি না।'

মিষ্টার টাঙ তাঁর একজন সেক্রেটারীকে ডাকলেন।

'মিষ্টার আও আশা করি তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে আমাদের একটু সাহায্য করবেন।'

পোয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

ঠিক সত্যিকথা বলবার ইচ্ছা পোয়ার মোটেই ছিল না। এত সব জটিল ব্যাপার অথচ কিছুই তাকে বলে নি। যাই হোক তাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। যেমন করে হোক শীগগিরই তাকে সাংহাইএর বাইরে কোথাও পাঠাতে হবে। তাই, বেশ শান্তভাবেই পোয়া এমন একটা চেহারার বর্ণনা করল যার সঙ্গে মালিনের কোন মিলই নেই—বরঞ্চ বহুলাংশে মিল আছে কাইনানের চেহারার সঙ্গে। সেক্রেটারী টুকে নিল। পোয়ার বলা হতে মিষ্টার টাঙ জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা বিশেষ কোন চিহ্ন, যেমন কোন জড়ুল—তার অঙ্গের কোথাও দেখেছেন কি?'

পোয়া উত্তর দিল—'না সে রকম কিছু দেখিনি।'

পোয়ার এই বর্ণনা যে মিষ্টার টাঙের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল এমন মনে হল না। যাই হোক তিনি ভদ্রভাবে বললেন—'মিষ্টার

আও, আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনি যে বর্ণনা দিলেন আশা করি তা নিখুঁত এবং সেই বিশ্বাসঘাতককে ধরবার কাজে বিশেষ সাহায্য হবে। আমি আর আপনাকে আটকে রাখতে চাই না। ভবিষ্যতে যদি আর কোন কথা তার সম্বন্ধে আপনি বলবার প্রয়োজন মনে করেন তো আমার এই সেক্রেটারীদের কাছে দয়া করে বলে যাবেন।'

পোয়া মিষ্টার টাঙকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় চাইতে মিঃ টাঙের ইঙ্গিতে তার সেক্রেটারী পোয়াকে অন্য একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল—'আপনি এখানে একটু বিশ্রাম করুন।' সেখানে আরও দুজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। পোয়া একটু আশ্চর্য হয়েই জানাল—'আমি মিষ্টার টাঙের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি, এবারে বাড়ী যাব।'

সেক্রেটারী বিনয় করে জানাল—'মিষ্টার টাঙের ইচ্ছা আপনি এখানে বিশ্রাম করবেন আর ইতিমধ্যে কিছু বলবার প্রয়োজন মনে করলে আমায় বলবেন। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে পোয়া আবার সেক্রেটারীকে তার বাড়ী ফিরবার অভিপ্রায় জানাল। কিন্তু সেক্রেটারী তাকে বলল যে মিষ্টার টাঙের ইচ্ছা যে সে আরও কিছুক্ষণ ভেবে দেখে। পুরো দু'ঘণ্টা এইভাবে বসে থাকল পোয়া। বহুলোক আসছে যাচ্ছে। চাকর বাকর ঘোরাঘুরি করছে। যে কোন দর্শক এলেই তারা চা দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করছে। মাঝে মাঝে পোয়াকেও চা দিয়ে যাচ্ছে। প্রায় চারটার সময় দারোয়ান এসে পোয়াকে জানাল যে মিষ্টার টাঙ তাঁর গাড়ীতে পোয়াকে বাড়ী পাঠাতে চান। সেই বাড়ী থেকে বাইরে এসেই পোয়া বুঝল যে দলের প্রত্যেকটি লোকের ওপরই তাকে চোখে চোখে রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে। বাড়ী ফিরে পোয়া ভাবল টানিকে ফোন করবে—কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল সেখানে ফোনে কথা বললেও

বিপদ হতে পারে। এইজন্য সে নিজে যে হোটেলে ছিল তার ম্যানেজারকে ফোন করল। হোটেলে পোয়া মিষ্টার চোয়ান নামে ঘর নিয়েছিল। ম্যানেজারকে বলে দিল যে সে দিনকয়েক হোটেলে ফিরবে না এবং ইতিমধ্যে সেই মহিলাটি যদি তার খোঁজ করে তা হলে তাকেও যেন ঐ কথা জানিয়ে দেয়।

* * * * *

টানি সারাটাদিন পোয়ার জন্য অপেক্ষা করল। যদি পোয়া আসে বা ফোন করে। রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে পোয়ার হোটেলে গেল কি ব্যাপার জানতে। হোটেলের ম্যানেজার তাকে জানাল যে মিষ্টার চোয়ান এইমাত্র ফোন করেছিলেন, জানিয়েছেন যে কয়েক দিনের মধ্যে ফিরতে পারবেন না তিনি, তাকেও ঐ কথা জানাতে বলেছেন। টানির মনে কথাটা বড়ই লাগল। কেন পোয়া তাকে একবার ফোন করল না!

পোয়া সারাদিন ধরে ভাবতে লাগল কি করে টানিকে বাঁচান যায়। ফোন করবার জন্য যখন বাইরে বেরিয়েছিল তখন লক্ষ্য করেছে যে একজন ফেরীওয়ালা তাকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছে। পোয়া বুঝেছে যেখানেই থাকনা কেন সে, মিষ্টার টাঙের লোক সর্বত্রই তাকে অনুসরণ করবে। কাইনান তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলেও কিছু বলে নি। পরদিন পোয়া আফেই কাকার সঙ্গে একবার পরামর্শ করবে স্থির করল। ঘটনার বিবরণ শুনেই তিনি বললেন—'সত্যি কথা কেন বললে না! মেয়েটি যদি নির্দোষ হয় তা হলে ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু সত্যিই যদি সে বিশ্বাসঘাতক হয় তা হলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।'

পোয়া উত্তর দিল—'আপনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝছেন না।'

আফেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পোয়ার মুখের দিকে চাইল।

পোয়া অকপটে মনের কথা আক্কেইকে বলল। আক্কেই সমস্ত শুনে বলল—'আচ্ছা, তোমার কি ধারণা তার সম্বন্ধে? সত্যিই কি সে অপরাধী?'

'কাল সারারাত ধরে সেই কথাই ভেবেছি। হয়ত অন্য কেউ তার নাম দিয়ে চিঠিপত্র চালাত, ফলে তাকে শুদ্ধ জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। যাই হোক্ আমি এমন কিছু করতে পারব না, যাতে তার কোন অনিষ্ট হয়।...যেমন করে হোক তাকে এখান হতে পল্লী অঞ্চলে সরাতে পারলে সে বোধ হয় কতকটা নিরাপদ হত। মিষ্টার টাঙ বেশ ভদ্র ও বিনয়ী হলেও...।'

'মিষ্টার টাঙের জন্য তোমার দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। তোমার মুখ থেকে জানতে না পারলেও তিনি সব জানতে পারবেন। আর সে ধরা পরলেও তোমার বিপদ। এইভাবে মিথ্যা কথা বলে আসাটা তোমার পক্ষে ভাল হয় নি।...তুমি টানিকে এসব কথা বলেছ?'

'না বলি নি, কিছুই স্থির করে উঠতে পারি নি এখনও। দু'চারজন লোকও আমার উপর নজর রেখেছে। বুঝছি এখন আমি মিষ্টার টাঙের নজরবন্দী।'

'না—তুমি বোধ হয় বুঝছ না কিসের মধ্যে পা দিচ্ছ তুমি। আমি জানি তুমি কাইনানকে পছন্দ কর না। এই মেয়েটির প্রতি তোমার যে ভালবাসা তা সাময়িক মোহ হতে পারে। নিতান্ত সাধারণ মেয়ে হলে এ বিষয়ে আমার বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু তার ব্যাপারে অনেক কিছুই সন্দেহজনক। পুলিসে তাকে ধরবার জন্য পরোয়ানা বের করেছে—আবার বিশ্বাসঘাতক বলে আমাদের লোকও তাকে শাস্তি দিতে চায়। তোমার কাছেই শুনেছিলাম একমাত্র ঐ মেয়েটির জন্যই তোমরা পিপিঙে বিপন্ন হয়েছিলে। এক্ষেত্রে আমার মনে হয়

কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখা ভাল। তারপর কাইনানের সম্বন্ধেও ভেবে দেখতে হবে, হয়ত তুমি তার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চাও।'

'কিন্তু দেরী করা চলবে না। আমায় একটা কিছু করতেই হবে।'

'তুমি বরং ফোন করে সব কথা জান এবং জানাও। সত্যিই যদি সে ঐ ধরণের মেয়ে হয় তা হলে তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখা চলবে না।'

পোয়া সেখান থেকেই ফোন ধরল।

'হ্যালো, লায়েনারা?…না আমার ওসব উকিল টুকিলের কথা মনে ছিল না।…আগে আমার কথা শোন। যত শীঘ্র পার সাংহাই থেকে চলে যাও।…বিশেষ কারণ আছে। মোটেই দেরী কর না।…নিজেই ভেবেচিন্তে স্থির কর কি ভাবে যাবে।…না আমি দেখা করতে পারব না।…না—কোন মতেই না। আমি এখন নজরবন্দী অবস্থায় আছি।…সব কথা ফোনে বলা সম্ভবপর নয়।…না কেঁদোনা…আমার কথা শোন—যেমন করে পার সাংহাই ছেড়ে চলে যাও।…সে তুমি নিজে স্থির কর।…'

লায়েনারা সব কথা শুনল কিনা বুঝল না পোয়া। লাইন কেটে গেল। পোয়া হতাশ হয়ে বলল—'না ফোনে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা—এক ফ্যাসাদ। আমার বরং গেলেই ভাল হত।'

আফেই উত্তর দিল—'ওসব ছেলে মানুষী কর না।'

পোয়া বলল—'কাকা আপনি বুঝছেন না। আমি তাকে বিয়ে করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—অথচ তাকে এতবড় বিপদে সামান্য সাহায্যও দিতে পারছি না।'

'শোন পোয়া, তোমাদের এইসব প্রেমের ব্যাপারে নাক গলাতে আমি চাই না বা পছন্দও করি না। তবু বলছি সেখানে গেলে তার

বিপদ তুমিই ডেকে আনবে। দু'জনেই একসঙ্গে ধরা পড়বে। বরঞ্চ একখানা চিঠি লেখ তুমি।'

শেষ পর্য্যন্ত পোয়া একখানা চিঠি লিখল এবং পোয়া চলে গেলে মিষ্টার আফেই গোপনে চিঠিটা পোষ্ট করবার ব্যবস্থা করলো।

* * *

সেদিন পোয়ার হোটেল থেকে এসে অবধি টানি একেবারে মুসড়ে পড়েছিল। নানা রকম চিন্তা আসতে লাগল তার মাথায়···হয়ত পোয়া তাকে ছেড়ে যেতেই চায়···হয়ত বা পোয়ার আত্মীয় স্বজনরা তার বিরুদ্ধে নানা কথা পোয়াকে বলেছে···না পুরুষদের বিশ্বাস করতে নেই···এইরকম নানা চিন্তা চলছে টানির মনে। রাত্রে ঘুম ভাল হল না। পরদিন ফোন বেজে উঠতেই ছুটে গিয়ে সে রিসিভারটা তুলে নিল। কিন্তু পোয়ার সমস্ত কথাই তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকল—হতাশা আরও বেড়ে গেল। একবার মনে হল পোয়া তাকে এড়িয়ে যেতে চায়, তাকে ছেড়ে যেতে চায়—তাই ঐরকম হেঁয়ালী করে বলল। আবার মনে হল—তাই তো—সে তো তাকে বারবার সাংহাই ছেড়ে যেতে বলেছে। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে টানি একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। যুমি তার স্বভাব সুলভ সল্পবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে টানির মন আরও ভেঙ্গে দিল। টানির কাছ থেকে সব শুনে যুমি বলল—'আমি জানতাম ঐরকম একটা কিছু হবে। তোমার অত মেশা উচিত হয় নি। যখনই শুনলাম ও বিবাহিত, তখনই বুঝেছিলাম যে ও তোমাকে নিয়ে একটু মজা মেরে সুযোগ মত কেটে পড়বে।'

অবশেষে টানি স্থির করল লাওপেঙের কাছেই যাবে তারা।···পরদিন সকালে দু'খানা চিঠি এল। একখানা পোয়ার এবং আর একখানা লাওপেঙের। ভয়ে ভয়ে টানি প্রথমে পোয়ার চিঠিখানা খুলল। ছোট্ট একখানা চিঠি—

'স্নেহের বোন লায়েনারা,

বিশেষ একটা ব্যাপার ঘটেছে যার জন্য আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। ফোনে সে কথা বলতে পারি না, চিঠিতেও সে কথা লেখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাই লিখতে পারলাম না। তুমি আমায় বিশ্বাস কর—বিন্দুমাত্র সন্দেহের স্থান দিওনা মনে। যত শীঘ্র পার সাংহাই ছেড়ে চলে যাও এবং বাইরে গিয়ে লাওপেঙের সঙ্গে দেখা কর। উপস্থিত তোমাকে কোন সাহায্যই করতে পারব না আমি, কাজেই তোমার যাবার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। কতক্ষণে তুমি নিরাপদে সেখানে পৌছাও জানবার জন্য উদ্বিগ্ন রইলাম। পথে খুব সাবধানে যাবে। অপরিচিতের সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা করবে না। ইতি তোমার…।'

কোন নাম সই নেই চিঠিখানাতে। প্রথমে চিঠিখানা পেয়ে টানির আনন্দই হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল এতেও কোন কারণ দেয়নি—তখন তার মনে হল বোধ হয় সত্যিই পোয়ার অভিপ্রায় তাকে প্রতারণা করা। যুমি খুব আগ্রহ সহকারেই জিজ্ঞাসা করল টানিকে—'কি লিখেছে পোয়া ?'

'কিছুই না—সেই এক কথা।'

'হুঁ।…কই পেঙকাকার চিঠিখানা তো পড়লে না।'

টানি লাওপেঙের চিঠিখানা পড়ে যুমিকে শুনাল। নান্‌কিন্‌ হতে লেখা। রাস্তার কথা, সেখানকার কথা, কি ভাবে কত কষ্টে লোকজন ও গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের সরান হচ্ছে এইসব। হাঙকোতে যাবার বিশেষ কোন স্থবিধে নেই, সর্ববিধ যান চলাচল বন্ধ। ডিসেম্বরের মধ্যে তাকে হাঙকোতে পৌছাতেই হবে। স্থবিধে বুঝলে পোয়া এবং তারা যেন হাঙকোতে তার সঙ্গে দেখা করে। যুমির কথা লিখতেও ভোলে নি।

যূমি চিঠিখানা শুনে বলল—'দেখ পেঙকাকার মত মানুষ হয় না। তার সঙ্গে যে ক'টাদিন আমরা ছিলাম—কত সুন্দর কেটেছিল আমাদের।'

টানি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসে বলল—'সত্যিই নেই।'

নানা কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ টানির সিয়াংগিয়ানের কথা মনে পড়ল। পোয়া কি তবে···। যূমিকে বলল—'যূমি চল নাইট ক্লাবে যাবে—নাচ ঘরে?'

যূমি বলল 'আমি তো কোনদিন যাই নি, চোখেও দেখি নি।'

'ঠিক আছে, চল আজ আমার সঙ্গে।'

* * * *

বাড়ী ফিরবার সময় পোয়া দেখল—তার বাড়ীর অদূরে একখানা মটর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। ফেরিওয়ালাটা নেই কিন্তু একজন ভিখারী বসে আছে। পোয়া বুঝল—এসবই তার ওপর নজর রাখবার জন্য। পোয়ার খেয়াল হল যে সিয়াংগিয়ান টানির ঠিকানা জানে এবং আরও অনেক সংবাদই সে রাখে। কাজেই সন্ধ্যাবেলায় পোয়া নাইট-ক্লাবে গেল। সিয়াংগিয়ানের সঙ্গে দেখা হতে তাকে তার সঙ্গে নাচবার জন্য অনুরোধ করল। সিয়াংগিয়ান রাজি হয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করল—'সে কোথায়?'

পোয়া চুপি চুপি সাবধান করে দিল, সে যেন টানি বলে তাকে ডাকে এবং কাউকে যেন তার ঠিকানা না দেয়। হেসে সিয়াংগিয়ান বলল—'আপনি বুঝি সেই জন্যেই এসেছেন? ঠিক আছে, আপনি আমায় এ বিষয়ে বিশ্বাস করতে পারেন।'

পোয়া সিয়াংগিয়ানের সঙ্গে নাচতে লাগল। হঠাৎ সে দেখতে পেল একজন লোক তার ওপর কড়া নজর রাখছে। লোকটিকে পোয়া মিষ্টার টাঙের অফিসে দেখেছিল। সিয়াংগিয়ানকে পোয়া এ ব্যাপারটাও জানাল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় টানি যুমিকে নিয়ে নাইট-ক্লাবে এল। যুমি কখনও এসব দেখে নি। তার বেশ ভালই লাগছিল। টানি চুপচাপ বসেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পোয়া এবং সিয়াংগিয়ানকে দেখতে পেল। যুমিকেও দেখাল। যুমি একটা অস্ফুট আওয়াজ করে বলল—'আমি যাই দেখে আসি কি রকম লোক সে।'

টানি তাকে নিরস্ত করল। বলল—'না তোমাকে যেতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি ওর দিকে। শুধু একবার দেখব ও আমায় দেখে কি করে। এই বলে টানি নাচঘরের দিকে গেল। যুমি সেখানেই বসে রইল। রাগে কাঁপছিল টানি। নাচতে নাচতে পোয়ার চোখ টানির চোখে পড়ল। মুহূর্তের জন্য পোয়া একটু বিব্রত বোধ করল কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে নাচতে নাচতে সরে গেল। টানির মনে হল তার পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। টানি ফিরে এসে যথাস্থানে বসল। নাচ শেষ হল। পোয়া ও সিয়াংগিয়ান সেইদিকেই আসছে, সেইদিক দিয়েই তাদের যেতে হবে। টানি খেয়াল না রাখলেও পোয়া বরাবর তার ওপর নজর রেখেছিল। টানি যেখানে বসে ছিল মাত্র তার হাত কয়েক দূরে পোয়া। কিন্তু পোয়া তার দিকে একবারও তাকাল না—যেন দেখতেই পায় নি। হেসে সিয়াংগিয়ানের সঙ্গে গলাগলি করতে করতে তার সুমুখ দিয়ে চলে গেল তারা। লজ্জা, ঘৃণা, অপমান ও হতাশা নিয়ে টানি যুমির হাত ধরে ফিরে এল হোটেলে। তার দেহে তখনও পোয়ার দেওয়া পোষাক।

'যুমি এস এদিকে! পোয়ার দেওয়া এগুলো গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে আমার।—এই বলে সে একে একে সেগুলি ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলল। হঠাৎ টানির শরীরটা কি রকম করে উঠল, মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল—অজ্ঞান হয়ে মেঝের উপর পড়ে গেল সে। যুমি ছুটে গিয়ে বার কয়েক তাকে ডাকল। কোন সাড়া নেই। প্রায় দশ মিনিট

পরে টানি চোখ মেলে চাইল। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হয়ে আবার উঠে বসে বলল—'যুমি আমাকে এ অবস্থায় কেউ দেখে নি তো?'

'না কেবল আমিই ঘরে ছিলাম।'

'উঃ, কি সাংঘাতিক একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।'

'ওসব কিছু নয়, সন্ধ্যেবেলায় ছাই ভস্ম যা দেখে এসেছ তাই। আচ্ছা তখন একটা ছোট সিল্কের টুকরো পুড়িয়ে ফেলেছ—তাতে কি সব লেখা ছিল। সেটা কি?'

'সে কিছুই নয়। ওতে আমার আর পোয়ার স্বাক্ষরে সত্যিই লেখা ছিল যে, আমরা উভয়ে চিরকাল উভয়কে ভালবাসব।'

'ওই সব ছাই ভস্ম পুড়িয়ে ফেললে দেখে আমায় আনন্দ হচ্ছে।'

'আমারও হচ্ছে।'

পরদিন সকালে টানি তখনও বিছানায় শুয়ে আছে। টেলিফোন বেজে উঠল। টানি উঠে ফোনটা ধরল।

'ওঃ'—তুমি?...কাল রাত্রের কথা...কিছুই শুনতে চাই না...আমার শোনবার কোন প্রয়োজন নেই...' টানি ঘৃণার সঙ্গে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। একটু পরেই আবার ফোন বেজে উঠল। একটু ইতস্তত করে টানি আবার রিসিভারটা তুলে নিল।

'...তোমার ওসব কথা শুনে আমি কি করব? তোমায় কিছুই বলতে হবে না।...তোমার পেছনে লোক লেগে আছে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার কোন দরকার নেই...বুঝেছি...বেশ তো কাটাচ্ছ—আবার কেন? এতদিন তোমার রক্ষিতা ছিলাম—এখন আর নই...হ্যাঁ ঠিকই বলছি...সিয়াংগিয়ানের কাছে যাও, তাকে নিয়ে মজা মার, ভোগ কর, যা খুসী কর, সেও তোমায় পছন্দ করে—চায়, আমায় আবার কেন, কোন সঙ্কোচের কারণ নেই...আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না...এখান থেকে চলে যাচ্ছি...' ঘৃণাভরে রিসিভারটা ছুঁড়ে

ফেলে দিল টানি। তখনও পোয়ার অস্পষ্ট কথা শোনা যাচ্ছে। যুমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল—'পাজি, গাধা, শূয়োর, ছোটলোককোথাকার—' রাগের মাথায় যুমি রিসিভারটার ওপরেই থুথু ফেলে সেটাকে যথাস্থানে রেখে দিল।

টানি যুমিকে বলল—'ওসব কথা তোমার বলার কি দরকার?'

'হ্যাঁ এক'শ বার বলব।'

হেসে টানি বলল—'দেখছি আমার চেয়ে তোমার রাগটাই বেশী হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তুমিই তো যত অনর্থের মূল। কেন তাকে কাছে ঘেঁসতে দিলে। আমি হলে দেখতে আগে বিয়ে করত—তারপর।'

টানি অন্যমনস্ক ভাবে বলল—'হয়ত সে আসবে।'

যুমি সঙ্গে সঙ্গে বলল—'এলে পর তার মুখে থুথু দিয়ে দিও।'

তবু যেন টানির মনে হচ্ছে সে আসুক। সারাদিনটাই সে প্রতীক্ষা করতে লাগল—যদি পোয়া আসে। কিন্তু পোয়া আর এল না।

পরদিন সকালবেলায় টানি যুমিকে নিয়ে ষ্টীমারে হঙকঙ রওনা হল। হঙকঙ থেকে ট্রেনে তারা হাঙকোতে চলল লাওপেঙের কাছে। রাস্তার মাঝে দুবার জাপানীদের বিমান আক্রমণ ছাড়া বিশেষ কোন বিপদের মধ্যে তাদের পড়তে হয় নি।

॥ ১৩ ॥

১৩ই ডিসেম্বরে নানকিনের পতন হয়। সাড়ে সাত লক্ষ নাগরিকের প্রায় সকলেই নগর ছেড়ে চলে গিয়েছে। হাজারে হাজারে আশ্রয়প্রার্থীর দল হাঙকোতে আসছে একটু আশ্রয়ের আশায়। রাস্তার দু'পাশে স্থানাভাবে ভীড় করে পড়ে আছে সৈন্য, স্কাউট, ধাত্রী, সরকারী কর্ম্মচারী এবং বহুলোক তাদের সাহায্যে ব্যস্ত। হোটেল,

রেঁস্তোরা, সিনেমা হল সব ভর্তি। বহু ক্ষুধার্ত্ত নরনারী রাস্তায় পড়ে। কত ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবার আজ পথের ভিখারী। এক মুঠো অন্নের জন্য, এতটুকু মাথা গুঁজবার স্থানের জন্য সকল সম্মান তাদের বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে। রণক্লান্ত সৈনিকরা অবিরাম সহরের বুকের উপর দিয়ে চলেছে। ইয়াংৎসি নদীর অপর পারেও বহু লোক ভীড় করেছে—এপারে আসবে, ওরাও পালিয়ে আসছে।

এই পলায়নের তুলনা বোধহয় ইতিহাসে আর কোথায়ও মেলে না!

এই যে বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে আসা, এই যে অস্বাভাবিক ভীতি, এ ভীতি যুদ্ধের জন্য নয়, গোলা-বারুদ কামান, উড়ো জাহাজ বা বোমার জন্যও নয়, এ ভীতি জাপানী বর্বরতাকে, জাপানীদের অমানুষিক অত্যাচারকে। সে বর্বরতা, সে অমানুষিকতার কল্পনা সভ্য জগত করতে পারে না। কে কোথায় দেখেছে একটি জীবন্ত শিশুকে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ বেয়নেটের মুখে গেঁথে নিতে! কিন্তু এরকম ব্যাপার তো তাদের কাছে তামাসা। চোখ বেঁধে যুদ্ধবন্দীদের পরিখার পারে দাঁড় করিয়ে তাদের দেহের ওপরে সঙ্গীন চালনা শেখা, নরহত্যা অভ্যাস করা। দুটো জাপানী পরস্পরের প্রাণনাশের বাজি রেখে প্রতিযোগিতা করে চলে কে কত লোক মারল। এই হিংস্রতার নজীর সভ্যজগতে কোথায়ও মেলে না—এমন কি আফ্রিকার আদিম বর্বর জাতিগুলোর মধ্যেও নয়, অথচ জাপানীদের কাছে এইটেই হচ্ছে গৌরবের বিষয়। মানুষের ইতিহাসের—এমন কি মানুষ যখন বানরগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত, সবে বানর থেকে অর্দ্ধমানবে পরিণত হয়েছে, জঙ্গলে থাকে ডালে ডালে বেড়ায়—তখনকার ইতিহাসেও এরকম নৃশংসতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। পশুজগতে, গরিলাদের মধ্যে যৌনসম্পর্কের জন্য মারামারি বা হত্যা ঘটে, কিন্তু নিছক আনন্দপাবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মমভাবে স্বজাতি হত্যা তাদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় না।

জানিনা মানুষ মরণকে ভয় করে কি না! তবে মানুষ মানুষকে ভয় করে। একজাতির বা এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য জাতির বা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের উপর যে নৃশংস অত্যাচার করে তা ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয়। বন্য গরিলারাও এত নৃশংসতার পরিচয় দিতে পারে না। তারা কখনও বন্দীদের ছাউনির মধ্যে পুরে কেরোসিন ঢেলে ছাউনিতে আগুন ধরিয়ে দেয় না বা ঐ বিভৎসতায় কোন উল্লাস প্রকাশ করে না। উন্মুক্ত দিবালোকে রতিসম্ভোগ করে গরিলারা, কিন্তু অন্য কোন পুরুষ গরিলা ঐ রতিক্রিয়া দেখে উৎকট আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে না বা তার পালা আসবার জন্য অপেক্ষাও করে না। সম্ভোগের পর স্ত্রীগরিলার যোনিদ্বারে সঙ্গীন ঢুকিয়ে দিয়ে নির্ম্মমভাবে তাকে হত্যাও করে না। অন্যের স্ত্রীর উপর বলাৎকার করবার সময় তার স্বামীকে সেইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে তাকে সেই কুৎসিত দৃশ্য দেখতে বাধ্য করবার মত সুরুচিও তাদের নেই।

এই সকল বর্ণনা কোন উপাখ্যানেও লেখা সম্ভব নয়। সকলেই মনে করবে এগুলো অর্দ্ধোন্মাদ লেখকের বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র। কিন্তু এ সমস্তই সত্য, চীন জাপানের যুদ্ধের ইতিহাসে এইসব অসম্ভাব্য ব্যাপার ঘটেছে। জাপানী সৈন্যদের কাগজ পত্রেও এর প্রমাণ আছে। ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়, তবুও একটা বিষয় ভাববার আছে —জাপানী জাতির মনস্তত্ত্ব। এর বিশ্লেষণ যৌনতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের অনেকখানি সাহায্য করবে। মেনসিয়াস বলেন যে, দয়া নাকি মানুষের স্বধর্ম্ম। যদি তাঁর কথা সত্য বলে মেনে নিতে হয় তা হলে আমাদের এও মানতে হবে যে জাপানীদের মধ্যেও গুণ আছে। কিন্তু আমরা এমনই একটা অবস্থায় এসেছি যেখান থেকে এর বিচার করতে পারি না। যখন আমরা জাপানীদের দিকে তাকাই, মনে হয় তাদের মধ্যে শুধু শয়তানই আছে তার চরম নির্লজ্জ হিংস্রতা নিয়ে। জাপানীদের

এই মনোবৃত্তি জাতি-মনস্তত্ত্বের বা অপরাধ বিজ্ঞানের কোন পর্য্যায়ে পড়ে তার বিচারের প্রয়োজন। সাধারণ লোকের কাছে এ মনস্তত্ত্ব কুহেলিকাচ্ছন্ন।

প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বসমক্ষে নারীসম্ভোগের একটা ব্যাখ্যা হয়ত আমরা করতে পারি ঐ শয়তান প্ররোচিত নির্লজ্জ হিংস্রতার সাহায্যে। কিন্তু যখন দেখি জাপানী সৈন্যবাহিনী প্রকাশ্যে উলঙ্গ হয়ে রাস্তার উপর বসে একসঙ্গে হস্তমৈথুন করছে সুদূর নানকিন সহরের উদ্দেশ্যে তখন তার কি ব্যাখ্যা করা যায়? তাদের মনস্তত্ত্ব, তাদের আদর্শ, তাদের নীতি, তাদের রীতি, তাদেব শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কি ধারণা করা যায়? সৈন্যবাহিনীর অফিসাররাই বা এই সব কি চোখে দেখে? সমগ্র জাপানী জাতিটাই বা এই ব্যাপারকে কি চোখে দেখে, তাদের নিজেদের সম্বন্ধেই বা তারা কি মত পোষণ করে? জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষরাই বা কেন এই বর্বরতা ও যৌনবিকৃতির বিকাশকে বন্ধ করার চেষ্টা করে না? বন্ধ করার ক্ষমতা তারা রাখে, না এতে তারা সম্মতিই জানায়? সৈন্যাধ্যক্ষরা কি মনে করে যে এইভাবে সৈন্যদের সন্ত্রাসবাদী করে তোলা যাবে, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যাবে? ঐ একই কারণেই কি তারা সাধারণ নাগরিকদেরও ঐ কাজে উৎসাহিত করে? এই বিকৃত মনোবৃত্তি ও যৌনবৃত্তি বিশ্লেষণের বাইরে—মন্তব্যের বাইরে।

* * * * *

দেশের আভ্যন্তরীণ এবং সামাজিক পরিবর্তন যুদ্ধে যে রকম হয় অন্য কিছুতেই সে রকম হয় না। এই পরিবর্ত্তনের হাত থেকে কেউই রেহাই পায় না। যারা ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয় তারা হয়ত সব চেয়ে বেশী দুর্ভোগ ভোগ করে, এই মাত্র। ঘরবাড়ী আত্মীয় স্বজন যথাসর্বস্ব ছেড়ে চলে এসেও নিস্কৃতি নেই। বহুদিনকার অভ্যাস ও সংস্কারগুলোও তার সঙ্গে ছাড়তে হয়—হয়ত বা সভ্যতা এবং কৃষ্টিকেও

বিদায় বাণী জানাতে হয়। স্নেহ, দয়া, মায়া, বাৎসল্য সবই জলাঞ্জলি দিতে হয়। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পিতামাতা সন্তানকে ত্যাগ করে চলে আসে, স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে পালায়, মুমূর্ষু দুঃস্থ প্রতিবেশী বা পথচারীকে দেখেও হৃদয়বৃত্তি দমন করে চলে আসতে বাধ্য হয় সভ্য মানব। যুদ্ধ যেন একটা ঘূর্ণিবাত্যা, একটা প্রলয়ঙ্করী ঝড়।···এই চীন যুদ্ধের ইতিহাস ভাবী বংশধরদের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়ে থাকবে। আজি হতে শতবর্ষপরে চায়ের মজলিসে, ভোজ সভায় উত্তর কালের বংশধরেরা এই ভয়াবহ যুদ্ধের গল্প করবে এক একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে,—ঝড়ে উড়ে যাওয়া এক একটা পাতার মত।

* * * * *

৫ই জানুয়ারী টানি ও যুমি লাওপেঙের কাছে পৌঁছল। লাওপেঙ তখন আহতদের শুশ্রূষায় ব্যস্ত। তাদের আসবার সংবাদ পেয়েই ব্যস্ত হয়ে লাওপেঙ তাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। টানির চেহারার ভীষণ পরিবর্ত্তন হয়েছে, যেন চেনাই যায় না। লাওপেঙ এসেই জিজ্ঞাসা করল—'পোয়া কোথায়? সে তোমাদের সঙ্গে আসে নি?'

টানি আস্তে আস্তে উত্তর দিল—'তার কথা বলবেন না, আমি একসময় আপনাকে সব বলব।'

'টানি, তোমার চেহারা এত খারাপ হয়ে গিয়েছে!'

'হ্যাঁ—আমি জানি আমাকে ভূতের মত দেখাচ্ছে।'

'কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।'

'সে পরে হবে, আমার কথা এখন থাক। আপনি এখন কি করছেন?'

'এই বৌদ্ধ সেবা সমিতির কাজ করছি।'

টানির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ব্যাগ্রভাবে বলল—'আমাদের আপনার কাজে নেন না।'

লাওপেঙ উত্তর দিল—'বেশ তো—সে তো খুব ভাল কথা।'

লাওপেঙ বুঝেছিল যে সাংহাইএ একটা কিছু ঘটেছে যার জন্য টানির এই পরিবর্তন। যাই হোক সে তাদের সঙ্গে করে কয়েকটা ঘরের মধ্য দিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপর তলার একখানা ঘরে নিয়ে এল বসাবার জন্য। ঘরে আগুন রাখবার ব্যবস্থা নেই। পাশের জানলা দিয়ে ইয়াংৎসি নদীটি দেখা যায়। ঘরে কোন খাট বা আসবাবপত্রও নেই। এক কোনে লাওপেঙের বিছানাটা গোটান আছে। লাওপেঙ তাদের বসতে দিয়ে বলল—'এই ঘরেই আমি থাকি। আশ্রয় প্রার্থীদের উপর তলায় আসবার অধিকার নেই। কাজেই আমি আছি এই ঘরে।'

'আমাদের থাকবার কি ব্যবস্থা হবে।

'তাই তো ভাবছি। তবে নদীর ওপারে যদি তোমরা থাক এবং দিনের বেলায় এসে কাজ কর তা হলে বোধ হয় চলতে পারে।'

তারা নীচে নেমে এল। বহু আশ্রয়প্রার্থী লাওপেঙকে দেখে নমস্কার জানাল। লাওপেঙ প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলল। কার চাল আছে, কার ওষুধ ফুরিয়েছে, কার কি প্রয়োজন প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে তদারক করল। সেখান থেকে তারা চলল চা খাবার জন্য। পথে পেঙ টানিকে জানাল আশ্রয় প্রার্থীদের অবস্থার কথা—তাদের জন্য কতটুকু ব্যবস্থা হয়েছে, এখনও কতলোক পড়ে আছে, খাওয়া তো দূরের কথা মাথা গুঁজবার জায়গাটুকুও পায় নি, কি দুরবস্থা, কি রকম অসহায় ভাবে তারা মরছে ইত্যাদি। নিকটেই 'ইয়েলো স্টর্ক টাওয়ার, বহু পুরান, প্রায় হাজার বছরের। টাওয়ারের উপর থেকে নদীর দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। তা ছাড়া টাওয়ারের উপর থেকে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। টাওয়ারটার খানিকটা অংশে সৈন্যরা বাস করে, বাড়ীটার অন্য অংশে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য শিবির খোলা হয়েছে। নদীর ধারে উপরের এক বারান্দায় একটি চায়ের দোকান। লাওপেঙ ওদের নিয়ে সেইখানে

গিয়ে বসল। চা খেতে খেতে লাওপেঙ টানিকে বলল—'এইবার বলত, পোয়ার কি ব্যাপার?'

টানি ধীরে ধীরে সব কথা বলল—পোয়ার হঠাৎ আসা বন্ধ করা—ফোনে কথা বলা—নাইট ক্লাবে সিয়াংগিয়ানের ব্যাপার—পরদিন আবার ফোনের কথা—যুমির গাল দেওয়া, ফোনে থুথু ফেলে দেওয়া ইত্যাদি সব।

লাওপেঙ ধীর ভাবে সব শুনে বলল—'আমার মনে হয় তুমি না ভেবে চিন্তেই এই সব করেছ। তোমাকেই পোয়া জীবনের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছিল।'

টানি হেসে বিদ্রূপের সুরে বলল—'আমি তাকে ঘৃণা করি। তাকে বিয়ে করার কথা চিন্তা করাই আমার ভুল হয়েছিল। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে হলে সে আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করতে পারত না।'

লাওপেঙ বলল—'না আমারই দোষ। আমি যদি তোমার কাছে থাকতাম তা হ'লে এসব অপ্রিয় ব্যাপার ঘটত না। আমার মনে হয় ভিতরে কিছু আছে যা আমরা কেউই জানি না।'

টানি প্রতিবাদ করে বলল—'নানা আপনার দোষ কিসের জন্য হবে। আপনি দুনিয়ার সব দোষই নিজের ঘাড়ে নিতে চান।'

'তার কাছ থেকে চিঠির আশা করছি। মনে হয় সে এ বিষয়ে কিছু লিখবে।'

তারা সেখান হতে উঠল একটু বেড়াবার জন্য। একটা রাস্তার মোড় ঘুরতেই তারা দেখল কতকগুলি ছেলেমেয়ে বসে আছে। লাওপেঙ তাদের কাছে গিয়ে একটা এক ডলারের নোট দিল তাদের। মনে হল ছেলেগুলি তার কাছে এটা আশাই করেছিল। সেখান থেকে যেতে যেতে পেঙ বলল—'এতে আর এদের কি হবে। দশদিন আগে এরা

এসেছে। আজ পর্যন্ত এখানেই আছে। এখনও কোন রকম জায়গার ব্যবস্থা আমি করতে পারছি না এদের জন্য।

টানি বলল—'পেঙকাকা আপনি বেশ সুখী।'

পেঙ হেসে বলল—'সুখী?'

'হ্যাঁ, আপনাকে না পেলে আমাদের যে কি অবস্থা হত তা কল্পনাও করতে পারি না।'

এই মধ্যবয়স্ক লোকটি টানিকে বেশ খানিকটা আকৃষ্ট করেছে।

টানি এবং যুমি নদীর ওপারে থাকে। সকাল বেলায় টানি এপারে চলে আসে লাওপেঙের সঙ্গে কাজ করবার জন্য। সন্ধ্যার পর আবার ফিরে যায় নিজের বাসায়। রাত্রেও বাকী সময়টুকু রেডিও ও খবরের কাগজ পড়ে কাটে। ঘর থেকে যে বেরিয়ে এসেছে, স্বেচ্ছায়ই হোক্ আর বাধ্য হয়েই হোক্, তার পক্ষে সারাদিন নানা কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা ছাড়া গতি কি? দিনের বেলায় লাওপেঙের নির্দ্দেশ মত টানি রোজ একবার করে ডাকঘরে যায় কোন চিঠিপত্র আছে কি না জানবার জন্য।

ইতিমধ্যে এক আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের একটি বছর বার বয়সের ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ছেলেটির নাম গুডলাক্। লাওপেঙ অনেক বলে কয়ে ছেলেটিকে নিজের ঘরে নিয়ে এল চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার জন্য। টানি তাকে অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঁচিয়ে তুলল।

কিন্তু ক্রমেই আশ্রয় প্রার্থীদের স্থান দেওয়া কঠিন হয়ে উঠছে। দলে দলে লোক আসছে। রোজই বহুলোক ফিরে যাচ্ছে স্থানাভাবে। একদিন একটি লোক দশ বছরের একটি মেয়ে এবং ছ'বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে আশ্রয়ের জন্য এল। জায়গা নেই। মেয়েটি অসুস্থ—হাটতে পারছে না। টানি তখন সেখানে। সে লাওপেঙকে তাদের কথা

বলল। সারা সকাল খোঁজ করে বহু কষ্টে তারা একটু স্থান পেল সহরেই একজনের বাড়ীতে। ভাড়া অবশ্য লাওপেঙকেই দিতে হবে।

সময় পেলেই টানি মেয়েটিকে দেখতে যেত। মেয়েটির নাম পিন্‌পিন্। ক্ষয়রোগে ধরেছে তাকে। কিন্তু মেয়েটির মুখের হাসি তখনও ম্লান হয়নি। মেয়েটির বাবা অধিকাংশ সময়ই ঘরে থাকত না। আর না থাকাতে ভালই হয়েছিল। লোকটির মেজাজ দিন দিন খিট্‌খিটে হয়ে উঠছিল। মেয়েটির অবস্থা তাকে আরও খিটখিটে করে তুলেছে। পিনপিনকে মোটেই দেখতে পারে না সে। সর্বদাই তার মৃত্যু কামনা করে তার দাদার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। এই মেয়েটির জন্যই নাকি তার দাদাকে ফেলে আসতে হয়েছে। কাজেই বাপের সম্মুখে মেয়েটি কষ্ট করে রোগ চেপে থাকে। জিজ্ঞাসা করলে বলে—ভাল আছি। কাশি পেলেও কাশে না। পিনপিনের কাছে টানি তাদের সব কথা শুনেছে। গত নভেম্বরে যখন নানকিনের পতন হয় তখন নৌকা ভাড়া করে তারা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তার বাবা ছয়শ ডলারও জোগাড় করতে পারে নি। ফলে তিন জনের নৌকা ভাড়া দিয়ে তারা চলে আসে। তার এক দাদা, বয়স পনের, তাকে মাত্র ত্রিশ ডলার দিয়ে তার বাবা তাদের নিয়ে চলে এসেছে। সে যে ভাবে পারে নিজের পথ দেখে নেবে। একেবারে চরম অবস্থা তাদের। অনেকদিন ভাল করে খেতে পায়নি। তার ওপর পথের পরিশ্রম, রোদ, জল, ঠাণ্ডা সবই সহ্য করতে হয়েছে। ফলে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ধরেছে মেয়েটিকে। এখন তার কাশিতে রক্ত দেখা দিয়েছে। তার দাদা আজও এসে পৌঁছায় নি। কে জানে তার কি হল।

একদিন বিকেল বেলায় লাওপেঙ টানিকে নিয়ে বেরুল সহরের উপকণ্ঠে যদি কোন বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়—আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য। সহর থেকে একটু দূরে হাঙসান পাহাড়ের দিকে তারা একটা বাড়ী

গেল। বাড়ীটাতে গত দশ বছরের মধ্যে কেউ বাস করে নি—ভূতের ভয়। লাওপেঙ বাড়ীটি ভাল করে ঘুরে দেখল। বারখানা ঘর আছে বাড়ীতে। ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত এবং মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধান। মাকড়সার জাল আর ধুলো ময়লায় ভর্তি। একখানা ঘরে রয়েছে দুটো কফিন। মালিক বলল—'আপনার ভূতের ভয় নেই—এই কফিনশুদ্ধ বাড়ী নেবেন ?'

'না ভূতের ভয়ের কোন কারণ নেই। ভূত আমি বিশ্বাস করি না—আর যদি থাকেও তা হলে তারা আমাদের কাজে হস্তক্ষেপই বা করবে কেন ? তাছাড়া যে ঘরটায় কফিন আছে ওঘরে আমিই থাকব।'

বাড়ীটি লাওপেঙ ভাড়া নিল। কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়ীর অবস্থা ফিরে গেল; আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে পরিণত হল। একদিন বিকেলে গুডলাক একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে সঙ্গে করে নিয়ে এল। লাওপেঙ ও টানি বৃদ্ধাকেও আশ্রয় দিল। বৃদ্ধার কেউ নেই। একমাত্র ছেলে, তাও বছর চব্বিশ পঁচিশ হল নিরুদ্দেশ—বেঁচে আছে কিনা কে জানে ! এখন সে শান্তিতে একটু মরতে চায়। যে ঘরটিতে কফিন আছে সেটি দেখে বৃদ্ধা বলল—'আমি এই ঘরেই থাকব।'

লাওপেঙ বলল—'ও ঘরে যে মৃতদেহ রয়েছে !'

'তা থাক।' তারপর আপন মনেই বিড় বিড় করে বলল—'আমার কপালে কি অমন সুন্দর কফিন জুটবে।' কথাটা লাওপেঙের কানে গেল।

বৃদ্ধা সেই ঘরেই থাকে। চলাফেরা করতে কষ্ট হয় বলে অধিকাংশ সময় ঘরের মধ্যে বা দরজার সম্মুখে বসে থাকে। যুমি বা গুডলাক তাকে খাবার এনে দেয়, সেখানে বসেই খায়।

কিছুদিন বাদে একটি মহিলা তার আঠার বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। এদের সঙ্গে লাওপেঙ ও টানির রাস্তায় দেখা।

লাওপেঙকে দেখে মেয়েটি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সবাইকেই তার ভয়। নানকিন সহরে এদের একটি রেস্তোরা ছিল। নানকিন যখন শত্রুদের হাতে যায় তখন মেয়েটিকে তার মা ও বাবা প্রতিবেশীদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয় হাঙকোতে। কিন্তু পথিমধ্যে নদী পার হবার আগে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সে। তার মা ও বাবা রেস্তোরাতেই থেকে যায়। তার মার বয়স পঞ্চাশ বছর। একদিন পাঁচজন জাপানী রেস্তোরায় খেতে আসে। খেতে খেতে তাদের নজর পড়ে মহিলাটির ওপর। স্বামী বাধা দেয়। ফলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে মেরে ফেলে। তারপর ঐ পাঁচজন পরপর মহিলাটির ওপর বলাৎকার করে—একটি পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধার ওপর!...পরে হঠাৎ একদিন রাস্তায় মা ও মেয়ের সাক্ষাৎ হয়।

* * *

অনেকদিন পোয়ার কোন খবর নেই। ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন বিকেলে লাওপেঙ পোয়ার একখানা চিঠি পেল—টানিকে লেখা। লাওপেঙ টানিকে চিঠিখানা দিয়ে বলল—'এই দেখ, পোয়ার চিঠি। বলেছিলাম হয়ত ডাকের গোলমাল হয়েছে তা না হলে এতদিন চিঠি আসে না। এই দেখ ভুল ঠিকানা দিয়েছে। নাও এবার পড় দেখি বসে।'

টানি এক রকম কাঁপতে কাঁপতে চিঠিখানা পড়ল। সুদীর্ঘ একখানা চিঠি। টানি যে তার উপর রাগ করেছে—ভুল বুঝবার সুযোগ সে টানিকে ইচ্ছে করেই দিয়েছিল—তার পর টেলিফোনে সে মোটামুটি বলতে চেয়েছিল সব, কিন্তু টানি শোনে নি—টানিকে বাঁচাবার জন্যই যে সে তাকে উপেক্ষা করেছে, নাচঘরে সিয়াংগিয়ানকে নিয়ে তার চোখের সম্মুখেই মজা মেরেছে এসব বলে—মিষ্টার টাঙের সঙ্গে তার কথাবার্তা, টানির বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ইত্যাদি সব আনুপূর্বিক জানিয়েছে। নাচঘরে সিয়াংগিয়ানের কাছে পোয়া গিয়েছিল, কারণ একমাত্র

সিয়াংগিয়ানই টানির ঠিকানা জানত। সিয়াংগিয়ান যাতে কাউকে সে ঠিকানা না দেয় তাই বলতে সে সিয়াংগিয়ানের কাছে গিয়েছিল। টানির সম্বন্ধে মিষ্টার লে যে অনুসন্ধান করছে এবং টানির যে সমূহ বিপদ উপস্থিত এ কথা সে সিয়াংগিয়ানকে বুঝায়। সিয়াংগিয়ানের সঙ্গে যখন পোয়া নাচছিল তখনও মিষ্টার টাঙের চর তার ওপর নজর রেখেছিল। সে চলে এলে সেই লোকটি সিয়াংগিয়ানের কাছে গিয়ে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করে। সিয়াংগিয়ানের সঙ্গে বহু মেয়ের আলাপ আছে কাজেই সে একটা মিথ্যে পরিচয় ও বর্ণনা দিয়ে দিয়েছে। নাচঘরে টানিকে উপেক্ষা করার পর টানি যে ক্ষোভে ও অভিমানে একটা যা তা কিছু করে বসেনি তাই রক্ষে, তা না হলে হয়ত সাংহাইতেই একটা বিপদ ঘটত। তারপর রাত্রে যখন ফোনে আবার নাচঘরের কথা বলতে গেল তখন টানি শুনল না—উপরন্তু 'পাজি শূয়োর গাধা' ইত্যাদি বলে গাল দিল।...পরের দিন যখন ফোন করে জানল যে টানিরা সাংহাই ছেড়ে চলে গিয়েছে তখন খানিকটা নিশ্চিত হল সে। টানি চলে এসে নিরাপদে পৌছে টেলিগ্রাম করবে এই আশা করেছিল সে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে এই চিঠি লিখছে। শেষবেশ জানিয়েছে যে নানকিনের পতন হয়েছে, শত্রুরা সহরে ঢুকে পড়েছে—কি করবে এখনও স্থির করে নি। চিঠিখানা পোষ্ট করেছে—১৩ই ডিসেম্বর।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে টানির চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। লাওপেঙ জিজ্ঞাসা করল—'ব্যাপার কি?'

টানি উত্তর দিল—'সে আমায় বাঁচাবার জন্য এত কিছু করেছে আর আমি...।' আর বলতে পারল না টানি, কান্নায় তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল।

লাওপেঙ চিঠিখানা নিয়ে পড়ে ফেরৎ দিয়ে বলল—

'আমি আগেই বলেছি যে ভিতরে কিছু আছে।...যাক সবই বুঝবার ভুল।'

টানির কান্নার বেগ একটু কমেছিল। সে বলল—'যুমির ওপর আমার এত রাগ হচ্ছে। পোয়ার ধারণা ফোনে আমিই তাকে গাল দিয়েছি।'

যুমি প্রতিবাদের স্বরে বলল—'আমার উপর রাগ করছো ভাল, সে এলে আমি তাকে বলব যে আমিই গাল দিয়েছি। কিন্তু যাই বল তোমার সেই লোককে আমি ভালবাসি না। তোমাকে বলে রাখছি—ভবিষ্যতে বিয়ে না করা পর্যন্ত তুমি তাকে কাছে ঘেঁসতে দেবে না।'

লাওপেঙ টানিকে উদ্দেশ্য করে বলল—'যাক এখন তো সব পরিষ্কার হল?'

'হ্যাঁ, আমার কাছে হল; কিন্তু আমাকে তো বলতে হবে তাকে আমার বক্তব্য—আমার অন্যায় আমি আজই তাকে লিখব।'

'তাই লেখ।'

টানি লাওপেঙকে জিজ্ঞাসা করল—'আপনার চিঠিতে কি লিখেছে?'

পেঙ পোয়ার চিঠিখানা দেখাল। যুদ্ধের পরিস্থিতি, তার সেই পুরান ষ্ট্র্যাটেজি, সামাজিক এবং পারিবারিক ব্যাপারে তার বীতরাগের কথা—আর কিছুই নয়।

লাওপেঙ বলল—'এইবার সে আসবে।'

'কিন্তু চিঠিতে তো সে রকম কিছুই লেখে নি।'

'তা না লিখুক, আমি জানি সে আসবে। আর সে এলে নিশ্চয়ই তুমি এই সব কাজ ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে চলে যাবে।'

টানি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে উঠল—'কক্ষনও নয়।'

লাওপেঙ হেসে উত্তর দিল—'আমি পোয়াকে যতটুকু জানি তুমি তাকে ততটুকুও জান না। এইভাবে দুচারজনকে বাঁচান নিয়ে সে

মাথা ঘামায় না। বড় বড় ব্যাপার তার মাথায় ঘুরছে—এই ধর যুদ্ধের ষ্ট্র্যাটেজি, রণনীতি, দেশের সামরিক পরিস্থিতি ইত্যাদি।

'তা হোক্, আমি তাকে বাধ্য করব এই কাজ করতে। আপনাকে ছেড়ে কোনমতেই আমি যেতে পারব না।'

টানি সেই দিনই পোয়াকে চিঠি লিখল—মিষ্টার আফেই-এর ঠিকানায়।

রেঁস্তোরা হতে বেরিয়ে টানি ও লাওপেঙ একটা ঘড়ির দোকানের খোঁজে চলল। টানির হাতঘড়িটার একটু গোলমাল হয়েছে, সারাতে হবে। মাত্র কয়েক মিনিট হেটেছে এমন সময় সাইরেন বেজে উঠল। এর আগেও জাপানীরা বহুবার বোমা ফেলেছে। আগে তাদের লক্ষ্য ছিল সামরিক ঘাঁটি, এরোড্রোম প্রভৃতি। কিন্তু ইদানিং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে নিরীহ নাগরিকেরা। টানি ও লাওপেঙ তাড়াতাড়ি পারঘাটায় গেল। নদী পার হয়ে তারা রিক্সায় উঠে কিছুদূর গিয়ে বাণ্ডষ্ট্রীটের পেছনে টেলিগ্রাফ অফিসে পৌছাল। তখন প্রায় মিনিট পনের কেটে গিয়েছে। একটা ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসছে—যেন একঝাঁক মৌমাছি উপর দিয়ে উড়ে আসছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হয়ে এল। বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো গর্জ্জন করে উঠল তারপরই ভীষণ আওয়াজে পায়ের নীচের মাটি কেঁপে উঠল। কে একজন বললে—মনে হচ্ছে যেন খুব কাছে। আবার ভীষণ আওয়াজ···আবার···আবার···পর পর আওয়াজ হয়ে যেতে লাগল···বিমান বিধ্বংসী কামান মুহুর্মূহু গর্জ্জন করছে। ধীরে ধীরে শব্দ থেমে গেল···আস্তে আস্তে গুণ গুণ আওয়াজ মিলিয়ে গেল। লোকজন বেরিয়েই আকাশের দিকে তাকাতে লাগল আর নিস্ফল আক্রোশে জাপানীদের গালাগালি দিতে লাগল—চুরি করার পর অসহায় গৃহস্থ যেমন করে চোরকে অভিশাপ দেয়, গালি পাড়ে। কতকগুলি ফায়ার বিগ্রেড চলেছে।

টানি ও লাওপেঙও বেরিয়ে এল। কাছেই একটা দোকানে ঘড়িটা সারাতে দিল। লোকে বলাবলি করছিল রেসকোর্সের দিকে নাকি বোমা বেশী পড়েছে। টানি ও পেঙ একটা ট্যাক্সিভাড়া করে সেই দিকে চলল। ফায়ার বিগ্রেডগুলোও সেই দিকে যাচ্ছিল।...এক জায়গায় বহু লোক ভীড় করেছে দেখে সেইখানে তারা নামল। কতকগুলো ঘর জ্বলছে আর ফায়ার বিগ্রেড সেই আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে। এ, আর, পির লোকেরা, বহু নার্স এবং স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা আহতদের উদ্ধারে ব্যস্ত। ভগ্নস্তূপ থেকে অনেক হত এবং আহতকে উদ্ধার করা হচ্ছে। রাস্তার একপাশে মৃতদেহগুলি জমা করা হয়েছে। জীবনে এই প্রথম টানি মূর্তিমান সত্যমৃত্যুকে মুখোমুখি দেখল। চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ আর ক্রন্দনের রোল।

সেখান থেকে তারা ওয়াঙচাঙে ফিরল। এখানে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী। খানিক আগে যে রেঁস্তোরায় বসে তারা চা খেয়েছিল সেটি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।

...স্তূপাকার মৃতদেহ, স্ত্রী পুরুষ শিশু কেউই এ মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পায় নি। কি বীভৎস ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছে মৃতদেহগুলি! কোথাও একখানা কাটা হাত পড়ে, কোথাও বা একখানা পা, কোথাও দেহের খানিকটা অংশ। কোন কোনটি এমন ভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়েছে যে যেন একটা মাংসপিণ্ড।...একটা মেয়ে বসে কাঁদছে, তার পাশে একখানা কাটা হাত, একটি শিশুর হাত, কি সুন্দর তার আঙ্গুলগুলি। একটা মেয়ে পড়ে আছে—তখনও মরেনি, তার উরুর খানিকটা মাংস উড়ে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। লাওপেঙ তার গায়ে হাত দিতে সে অব্যক্ত যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে উঠল। টানি একটি স্বেচ্ছাসেবিকাকে ডাকল। তার গাউনটাও রক্ত মাখা। টানি তাকে জিজ্ঞাসা করল—'আপনি কি নার্স?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। আহত মেয়েটিকে নিয়ে যাবার পর টানি স্বেচ্ছাসেবিকা মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করল। তার নাম চিউ। টানি তাকে নিজের নাম জানিয়ে বলল—'দেখুন নিকটেই আমরা একটি আশ্রয়প্রার্থী শিবির খুলেছি। আহতদের মধ্যে জনকয়েককে আমরা স্থান দিতে পারি, কিন্তু আমাদের ওখানে কোন ডাক্তার নেই—এই অসুবিধা, আপনি যেতে পারবেন?'

চিউ হেসে উত্তর দিল—'চলুন, আমার তো এখন ডিউটি নেই—স্বেচ্ছায়ই এসেছিলাম।'

চিউকে সঙ্গে করে তারা শিবিরে ফিরল। সকলেই ছুটে এল তাদের কাছে, সবাই তাদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। টানি দেখল যে পিনপিন নেই। তার কথা জিজ্ঞাসা করতে একজন বলল—বোমা পড়বার সময় সে দৌড়ে বাগানে গিয়েছিল লুকোবার জন্য। এমন সময় একজন এসে টানিকে যুমির কাছে যেতে বলল। একটা ঘরে যুমি মুখ গুঁজে পড়ে আছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছে। টানি তার কাছে যেতেই সে টানির হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বলল—'সময় হয়ে এসেছে।'

টানি চিউর দিকে তাকাল। চিউর বুঝতে বাকী ছিল না। সে বলল—'ঠিক আছে আমি এ বিষয়েও সাহায্য করতে পারব।' চিউ হাসপাতালে একখানা চিঠি লিখে দিল কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাঠাবার জন্য। টানি চিঠিখানা দিয়ে গুডলাক্‌কে হাসপাতালে পাঠাল।

যুমির চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। সে টানিকে বলল—'যদি সেই শয়তানের বাচ্চাটা হয়?'

টানি একটু ধমক দিয়ে বলল—'ও সব বাজে কথা রাখ—আমি বলছি যে সে তোমারই, তোমার স্বামীরই ছেলে।'

ভয়ের জন্য এই অসময়ে যুমির প্রসব বেদনা উঠেছে। টানি চিউকে যুমির সমস্ত কথা বলতে চিউ বলল—'দেখুন আমাদের অর্থাৎ

মেয়েদেরই দুর্ভোগ সব চেয়ে বেশী। কিছুদিন আগে আমাদের হাসপাতালে একটা সন্ন্যাসিনী আসে, তারও ছিল এই অবস্থা। সে ও তার ছেলেটিকে নষ্ট করতে বলে ?'

'আপনারা তাই করলেন ?'

'না করে উপায় ! সে আত্মহত্যার ভয় দেখাল।'

টানি একটু ইতস্তত করে লাওপেঙকে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা পেঙকাকা ছেলেটি যদি জাপানীর হয় ?'

'সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। ছেলেটি যদি দেখতে যুমির স্বামীর মত হয় তা হলে কোন কথাই নেই। তা না হলে কি করে বলা যাবে যে ঐ শিশু জাপানী। যাই হোক আমরা একটা প্রাণ নষ্ট করতে পারি না।'

'কিন্তু যুমিকে কি বলব, সে তো সহ্য করতে পারবে না।'

'তাকে যা হয় একটা মিথ্যে কথা বল।'

'তা না হয় বললাম, কিন্তু সত্যিই যদি শিশুটি জাপানী হয় তো তাকে নিয়ে আমরা কি করব ?'

'সে পরে ভেবে দেখা যাবে।'

'জাপানী শিশুকে মানুষ করতে আপনার কোন দ্বিধা নেই ?'

'না—অকারণ প্রাণহানি করতে পারি না আমরা।' এমনি সময় পিন্‌পিনের ভাই এসে বলল যে সে টানিকে দেখতে চায়।

টানি উঠে চিউকে সঙ্গে নিয়ে পিন্‌পিন্‌কে দেখতে গেল।

পিন্‌পিন একটা লেপমুড়ি দিয়ে পড়েছিল। তার ঘরে ঢুকতেই পিন্‌পিনের বাবা তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য উঠে দাঁড়াল। পিন্‌পিন অভিমানের সুরে টানিকে বলল—'আপনি তো আজ একবারও আসেন নি আমায় দেখবার জন্য ?'

টানি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'আমি আজ বড় ব্যস্ত ছিলাম সেই

জন্য আসতে পারি নি। হাঙকোতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ফিরে দেখি যুমি অসুস্থ। জাননা বুঝি যে তার ছেলে হবে।'

পিন্‌পিনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।…টানি চিউর পরিচয় দিল, তাকে যে সে দেখতে এসেছে তাও বলল। চিউ লক্ষ্য করল পিন্‌পিনের কাশিতে রক্ত। ঘরটাতে বিশেষ আলো বাতাস নেই, তার ওপর পিন্‌পিনের ভাই তার সঙ্গে একই বিছানায় শোয়। চিউ টানিকে তাদের আলাদা ভাবে শোবার ব্যবস্থা করতে বলল। পিন্‌পিন টানিকে বোমা পড়ার সময় কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করল। টানি সব কথা বলল। তারপর তারা বেরিয়ে এল। পিন্‌পিনের বাবাও তাদের সঙ্গে ঘরের বাইরে এল। চিউকে সে তার মেয়ের অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করলে চিউ উত্তর দিল যে তার মেয়েকে যক্ষায় ধরেছে। তার বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসার প্রয়োজন।

সেখান থেকে বেরিয়ে টানি ও চিউ আবার যুমির কাছে এল। কিছুক্ষণ পরে যুমি একটা পুত্র সন্তান প্রসব করল। টানি তাকে বুঝাল যে সে ছেলে তার স্বামীরই, জাপানীর নয়। যুমি যেন একটু স্বস্তি পেল।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই কি ভাবে রটে গেল যে যুমি একটা জাপানী ছেলে প্রসব করেছে। আশ্রয়প্রার্থীদের অনেকেই ঔৎসুক্য বশে দেখতে আসত জাপানী শিশু কি রকম দেখতে। দু'সপ্তাহ যেতেই পরিষ্কার বুঝা গেল যে যুমির স্বামীর সঙ্গে তার ছেলের কোন সাদৃশ্যই নেই। যুমি তাকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করতে রাজি হল না। অগত্যা লাওপেঙ ও টানি ছেলেটিকে নিয়ে লাওপেঙের ঘরে রাখল। বহুকষ্টে কন্‌ডেন্‌সড মিল্ক খাইয়ে তারা তাকে মানুষ করতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় টানি দেখল ছেলেটি বিছানার ওপর মরে পড়ে আছে। লেপটি তার গায়ে আঁট করে জড়ান। টানি বুঝল এইভাবে লেপ জড়িয়ে দম বন্ধ করে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। টানি

যুমির ঘরে গেল। যুমিকে দেখলেই বুঝা যায় যে একাজ তারই। সে সোজা যুমিকে জিজ্ঞাসা করল—'তুমিই এ কাজ করেছ?'

যুমি ভীত ভাবে উত্তর দিল—'হ্যাঁ আমিই—যত শীগ্‌গীর এর জীবন শেষ হয় ততই ভাল।...লজ্জায় আমি মুখ দেখাতে পারছিলাম না। সবাই আমায় দেখে আর হাসে।...তুমি কিন্তু কাউকে বল না যে আমি এ কাজ করেছি...শুধু বল যে ওটা মরে গিয়েছে।'

লাওপেঙ ফিরতে টানি তাকে সব কথা জানাল। ক্রোধে লাওপেঙের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করল। টানি ভেবেছিল লাওপেঙ হয়ত যুমিকে এই নিয়ে খুব ভৎর্সনা করবে। কিন্তু লাওপেঙ কিছুই বলল না তাকে, সমস্ত কথা শুনে শুধু বলল—'বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছেলেই করল। সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে—একটা পাপ আর একটা পাপকে ডেকে আনে...কি করে সে স্থির সিদ্ধান্তে এল যে এটা জাপানীরই ছেলে?... যা হবার হয়ে গিয়েছে—এর ওপর আমাদের কোন হাত নেই—তবে যুমির এই নিষ্ঠুরতাকে আমি ঘৃণা করি।'

ছেলেটির অন্তেষ্টিক্রিয়া হয়ে গেলে রাত্রে লাওপেঙ অবকাশ সময়ে টানিকে বলল,—'দেখ' একেই বলে কর্ম্মফল। ছেলেটিকে জন্মাতে দেখলে—মরতেও দেখলে। ছেলেটির এই অকাল মৃত্যুর জন্য হয়ত তুমি শোক করবে, কিন্তু তা করার কোন মানেই হয় না। এ জগতে কে দীর্ঘজীবি? সবই ক্ষণস্থায়ী। আমরা কেউই জীবনটা দেখতে পাই না, চিনতে পারি না, জন্মাই এবং মরি। জীবনকে চিনতে পারা, সম্যক উপলব্ধি করাই হচ্ছে জ্ঞানের লক্ষ্য। এই জ্ঞান পেতে হলে সর্বপ্রথম রিপু দমন করতে হবে, অহং বোধ ত্যাগ করতে হবে। নিজের সঙ্গে অন্যের ভেদজ্ঞান যতদিন থাকবে ততদিন এই জ্ঞান লাভ হতে পারে না। এই জ্ঞান লাভ হলেই মুক্তিলাভ হয়—যাকে আমরা মোক্ষপ্রাপ্তি বলি। আমাদের এই জগত হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,

আমাদের মোহ'ও বুদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যতকিছু পার্থক্য আমরা দেখি সবই আমাদের নিজেদের বুদ্ধি ও মোহ জাত। সুখ, দুঃখ, ঘৃণা, ভালবাসা সব কিছুই আমাদের কৃত, আসলে তাদের মধ্যে আমাদের কোন পার্থক্য নেই। সবই হচ্ছে আমাদের অবিদ্যার কারণ। এই অবিদ্যা দূর করতে পারলেই আমাদের জ্ঞান বা প্রজ্ঞা লাভ হয় এবং তাতেই আমাদের মোক্ষ। অজ্ঞতা, কার্য্য এবং আকাঙ্ক্ষা হতে আমাদের বিজ্ঞানের (জ্ঞানের) উৎপত্তি। কোন বস্তুকে প্রথমে আমরা ইন্দ্রিয় সাহায্যে উপলব্ধি করি। বস্তুর স্বরূপ এবং ভিন্নতা আমরা মনের সাহায্যে নির্ণয় করি। এই বিশ্ব প্রতিমুহূর্তে লয় হচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে সৃষ্টি এবং প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস। তার মধ্যে কোন ছেদ নেই—একটানা চলেছে—যেমন নদীর স্রোত চলে, পূর্বমুহূর্তে যে জলকণা যেখানে ছিল পরমুহূর্ত্তে আর সেখানে নেই, পূর্বস্থিতি তার ধ্বংস হয়েছে।··· কাজেই দেখ সব কিছুই অবিনশ্বর, ধ্বংসের স্রোতের টানে চলেছে। কেবলমাত্র মনের কোন সমাপ্তি নেই, ধ্বংস নেই।'

টানি জিজ্ঞাসা করল—'তা হলে কি জীবন বলে কিছু নেই—অর্থাৎ জীবনটা এক বিরাট শূন্যতা ?'

'শূন্যতা কথাটির অর্থ পরিষ্কার নয়। কারণ শূন্য বলতে আমরা বুঝি যার কোন অস্তিত্ব নেই এবং এই জন্য নির্বাণ বা মোক্ষ বলতে লোকে মনে করে জীবনের পরিসমাপ্তি, তার বিলোপ সাধন। আসলে কিন্তু তা নয়। আসলে হচ্ছে ব্যাষ্টির লোপ। আমরা বাস করি যে জগতে তা সব দিক হতেই সীমাবদ্ধ। নিরবিচ্ছিন্ন অসীমের কল্পনা আমরা করতে পারি না। সেই কারণেই আমরা নির্বাণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারি না।'

'তা হলে আমাদের কর্ম্ম কি হবে ? বিয়ে করা বা ছেলে মেয়ের জন্ম দেওয়ার তো কোন মানেই হয় না !'

'না, তা নয়, প্রেম, ভালবাসা বা সংসার করা এগুলি কর্ম্মের অঙ্গ। যখনই আমরা দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি তখনই আমাদের আকাঙ্খা, ভালবাসা ইত্যাদি থাকবে এবং এরা আমাদের হতাশা এবং দুঃখ বাড়াবেই। কর্ম্মকে ফাঁকি দেবার কোন উদ্দেশ্যই আমাদের নেই। কার্য কারণ সম্পর্ককে অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। তবে আমাদের এই প্রেম, ভালবাসা, আশা আকাঙ্খা ইত্যাদির মূল কি, এর পরিণাম কি, আত্মার সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক, নির্বাণের সঙ্গেই বা কি সম্পর্ক তা জানতে পারা বা উপলব্ধি করাই হচ্ছে মুক্তির প্রধান উপায় —নির্বাণের প্রথম এবং প্রধানতম সোপান।

॥ ১৪ ॥

পোয়ার চিঠি পাবার পর টানি তাকে টেলিগ্রাম করেছে, চিঠি লিখেছে, আজও কোন উত্তর এল না। টানি ভেঙ্গে পড়ল। তার শারীরিক অবস্থাও খুব খারাপ। একদিন সকালে টানি একা একা বেড়াতে বেরুল। কখন জানে না পাহাড়ের ধারে রাস্তার ওপর মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। কতক্ষণ যে এ অবস্থায় পড়েছিল তা নিজেই জানে না। চেতনা ফিরতে উঠবার চেষ্টা করেও অসমর্থ হয়। ঘটনাচক্রে সেখান দিয়ে একজন কাঠুরিয়া যাচ্ছিল। সে টানির অবস্থা দেখে তাকে সঙ্গে করে এনে বাসায় পৌঁছে দেয়। যুমি লাওপেঙকে খবর দিতে, সে টানিকে একলা বেরুতে মানা করে দিল। যুমি লাওপেঙকে বলল,—'টানির বোধ হয় ছেলে হবে।' টানি মুখ ঘুরিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। লাওপেঙ বিব্রত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুদিন পরে রাত্রিবেলায় টানি যেয়ে লাওপেঙের ঘরের দরজায় ধাক্কা

দিল। লাওপেঙ বিছানার উপর বসে টানিকে জিজ্ঞাসা করল,—'কি স্থির করলে ?'

টানি কোন উত্তর দিল না।

'তোমার ভাবনার কোন কারণ নেই। শীগ্‌গীরই হয়ত পোয়ার চিঠি এসে যাবে।'

টানি উত্তর দিল—'তিন সপ্তাহ কেটে গেল আজ পর্যন্ত যখন এল না…।'

'আমি বলছি সে লিখবেই। শুধু তাই নয় সে আসবে আমার কাছে।'

'তা না হলে আমাকে চিউর সাহায্য নিতে হবে।'

লাওপেঙের বুঝতে বাকী রইল না যে টানির মনের কথা কি। তার মুখে চোখে এক আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল।

লাওপেঙ বলল—'যাই হোক্ না কেন তুমি একটা জীবন নষ্ট করতে পাবে না—আমি তা করতে দেব না।'

'পিতৃ পরিচয়হীন, পিতৃ নামহীন ছেলে…' টানি ঠোঁট কামড়াল। 'এও বোধ হয় কর্ম্মফল! আমার পরিচয় আমার মার নামে, আবার আমার ছেলের পরিচয় হবে আমার নামে—আর যদি মেয়ে হয় তা হলে তার ছেলের নামও হবে এই 'সুই' নামে…।'

'যা হয় একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।' লাওপেঙ স্থির দৃষ্টিতে টানির দিকে চাইল। 'ছেলে হোক তখন তার নামের একটা ব্যবস্থা হবে।'

টানি জিজ্ঞাসা করল—'কি ব্যবস্থা হবে ?'

'যদি পোয়ার কোন সংবাদ না পাওয়া যায়…আর তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তা হলে না হয় তোমার ছেলের পরিচয় পেঙ-বংশানুযায়ী হবে।'

'আমার জন্যই কি আপনার এই স্বার্থত্যাগ ?'

'টানি, কথাটা বোধ হয় এভাবে তোমায় না বলাই উচিত ছিল। আমি কোন স্বার্থত্যাগই করছি না—ছেলেটির একটা পরিচয় বা নামের বন্দোবস্ত করছি মাত্র।...আমাকে ভালবাসবার জন্ম তোমায় অনুরোধ করবার সাহস আমার নেই।'

'আমাকে রক্ষা করবার জন্য বা লজ্জার হাত থেকে আমায় বাঁচাবার জন্যই কি আপনি আমায় বিয়ে করতে চান?'

'না, তোমার তুলনায় আমার অনেক বয়স হয়েছে...আমি সে প্রস্তাব করতে পারি না...তবে তোমার মূল্য বুঝবার বা তোমায় বুঝবার বয়স আমার আছে।'

লাওপেঙ টানির মুখের দিকে চাইল। তার মুখে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা কিন্তু বিব্রতের ভাব।

লাওপেঙ আবার বলল—'তুমি ভাল করে বুঝে দেখ। পোয়ার জন্য অবশ্য আমরা অপেক্ষা করব। তুমি তাকে ভালবাস, এ তারই ছেলে। তবে যদি সে না আসে বা তার মত পরিবর্তন হয়...তা হলে...'

'তা হলে আপনি আছেন?'

'হ্যাঁ।'

টানির হাতখানা লাওপেঙ নিজের হাতের মধ্যে নিল। টানি বুঝল লাওপেঙের এই ত্যাগ আত্মত্যাগের চেয়েও অনেক বড়, অনেক কঠিন। হঠাৎ হাতখানা টেনে নিয়ে টানি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেলিফোনে টানির উত্তর শুনে পোয়া বুঝেছিল যে টানি তাকে ভুল বুঝেছে। কাজেই তা নিয়ে সে বেশী মাথা ঘামায় নি। কিন্তু যতই দিন যায় ততই পোয়ার মনের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। ইতিমধ্যে নান-কিনের পতন হয়েছে, প্রায় একলক্ষ সৈন্যের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে; দৈনিক তিন চার হাজার করে সৈন্য মারা পড়ছে। আন্তর্জাতিক

কর্তৃত্বাধীন সাংহাই-এ জাপানীরা ঢুকে পড়েছে। টানিকে যে চিঠি লিখেছিল তা ফিরে এল, বিলি হয় নি। সেই চিঠি আবার লাওপেঙের ঠিকানায় পাঠাল।...টানিকে বিয়ে করার প্রশ্নও আর আগেকার মত সহজ নয়। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। সমস্ত কিছু না জেনে অদূর ভবিষ্যতে তাকে বিয়ে করা উচিত হবে না।...আবার মাঝে মাঝে লাওপেঙের ওপরও তার ঈর্ষা হয়। কিন্তু লাওপেঙকে সে জানে। তা হতে পারে না। আর টানি,—না লাওপেঙের বয়সের লোককে সে ভালবাসতে পারে না। কিন্তু পেঙ হয়ত তাকে অবিশ্বাস করবে। সে তো কিছুই জানে না, টানির মুখে শুনে সব কথাই বিশ্বাস করবে সে। পেঙ সকলকেই সরলচিত্তে বিশ্বাস করে। এই মানসিক দোদুল্যমান অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পোয়া শেষ পর্যন্ত সিয়াংগিয়ানের সঙ্গেই অধিকাংশ সময় কাটাতে লাগল।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি লোলা সংহাইএ এল। সে ও মালিনের অতীত ইতিহাস কিছুই বলতে পারল না। মালিন সম্বন্ধে পোয়ার সন্দেহ যেন দানা বাঁধতে লাগল।...

পোয়ার জীবনের এই পরিবর্ত্তনে সবচেয়ে সুখী হয়েছিল কাইনান। কিন্তু পোয়ার জগত এবং কাইনানের জগত ভিন্ন। ক্রমে মানচিত্র, কাগজপত্র এবং বইএর মধ্যেই পোয়া ডুবে থাকতে আরম্ভ করল।

এমন সময় পোয়ার এক বন্ধু চিনের সঙ্গে দেখা। কলেজের বন্ধু, আমেরিকা থেকে কত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছে। দেশের ভেতরে মোটর রাস্তা করবার ভার পড়েছে তার ওপর। তারই সাহায্যে পোয়া মিলিটারী কমিশন পেয়ে গেল। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কলেজে পড়াশুনা করেছিল পোয়া। তাই, ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তার চাকরী হল, যদিও ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভূগোলটাই তার ভাল জানা ছিল। ঠিক হল পোয়া চিনের সঙ্গেই রওনা হবে। তাতে সুবিধাও ছিল,

খাওয়া থাকার ব্যবস্থা চিনই করবে। পোয়া কাইনানকে তার চাকরীর কথা বলল। কাইনান প্রথমে বিশ্বাস করল না পরে নিয়োগপত্র দেখে তার বিশ্বাস হল।

পোয়া চলে যাবার তিনদিন পরে লাওপেঙের টেলিগ্রামটা এল। আফেই টেলিগ্রামটা পোয়ার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল। এর প্রায় দু'সপ্তাহ পরে টানির চিঠিখানা এল। কাইনান দেখল চিঠিখানা হাংকো থেকে আসছে। সে চিঠিখানা খুলে পড়ল। চিঠিখানা পড়ে ভীষণ রেগে গিয়ে সে তৎক্ষণাৎ টানিকে খুব কড়া করে একখানা চিঠি লিখল এই সব ব্যাপার বন্ধ করতে বলে। তার সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিল যে পোয়ার মন থেকে তার কথা মুছে গিয়েছে। তারপর চিঠিখানা ঠিকমত এঁটে পোয়ার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল।

আরও দু' সপ্তাহ বাদে চিঠিখানা পোয়ার কাছে পৌছল। সে আগেই টেলিগ্রামটা পেয়েছিল। টেলিগ্রাম পেয়েই পুনরায় টেলিগ্রামে সে তার নতুন ঠিকানা জানিয়েছিল। টানি উত্তরে টেলিগ্রাম করে জানতে চেয়েছে যে পূর্ব্বের চিঠিখানা সে পেয়েছে কিনা। এমন সময় চিঠিখানা পোয়ার হাতে এল। চিঠিতে টানি তার নিজের অপরাধের কথাই লিখেছে। সে যে পোয়াকে ভুল বুঝেছিল, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল—তার জন্য তার আত্মগ্লানির অন্ত নেই।···নানাকথা প্রসঙ্গে কাইনানের কড়া চিঠির কথাও লিখেছে। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ সম্বন্ধেও জানিয়েছে যে সে যার রক্ষিতা হয়ে ছিল সে-ই এই সকল কাজ করত এবং টের পেয়ে সে-ই পালিয়ে গিয়ে খবর দেয়, এবং তারই কথামত তারা ঐ বাড়ীতে হানা দেয়। কিন্তু সে নিজেই যে সুই মালিন তখন সে পরিচয় দেয় নি তার জন্যই এত বিভ্রাট এবং বিপদ। লাওপেঙও এসব কথা জানে।

বহুদিন বাদে শান্তির নিশ্বাস ফেলল পোয়া।

মার্চ মাসের মধ্যেই হাংকোর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন

হ্যাঙকোই হচ্ছে যুদ্ধকালীন রাজধানী—প্রধান সামরিক কেন্দ্র। চীনের দুর্যোগ কেটে এসেছে। সোভিয়েট প্লেন এবং পাইলট এসে গিয়েছে—বিমানবাহিনী শক্তিশালী হয়েছে। নতুন অস্ত্র-শস্ত্র, ও ট্যাঙ্ক আমদানী হয়েছে। সামনের এপ্রিলেই হয়ত একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে।

হেঙইয়াং থেকে পোয়ার চিঠি আসবার কয়েকদিন পরেই লাওপেঙ হ্যাঙকোর এক হোটেলে গিয়ে বাস করতে লাগল। টানি কারণটা ঠিক বুঝল না। পোয়ার চিঠি পাবার জন্য না এমনিই লাওপেঙ সরে গেল বুঝা কঠিন। পোয়ার চিঠিটা টানিকে দিয়ে পেঙ্ বলেছিল—'সে এসেছে।' হয়ত বা কথাটা বলতে গিয়ে পেঙের গলাটা একটু কেঁপে গিয়েছিল কিন্তু টানির তা লক্ষ্য করবার অবস্থা তখন ছিল না—পোয়ার চিঠি পেয়ে আনন্দ ও আবেগে সে তখন বিভোর। সেদিন রাত্রে কথা-প্রসঙ্গে টানি লাওপেঙকে বলেছিল—'পোয়া এলে ভালই হবে। তার টাকাপয়সা আছে—আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। অনেক আশ্রয়প্রার্থীকে আমরা বাঁচাতে পারব।'

'হয়ত তাই হবে।' লাওপেঙের কথার মধ্যে যেন কোন প্রাণের সাড়া নেই।

টানি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'আপনিও ত তাই চান?'

লাওপেঙ কি রকম একটা ফাঁকা চাহনিতে টানির দিকে চাইলো—যেন কথাটা ঠিক বোঝে নি। অবশেষে উত্তর দিল—'হ্যাঁ, কিন্তু যত শীগ্‌গীর সম্ভব তোমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার।'

টানি বলল—'তা তো হল, আপনি আমাদের সঙ্গে বাস করবেন তো?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে লাওপেঙ বলল—'প্রত্যেকেরই কপাল বা ভাগ্য বলে একটা জিনিষ আছে। হয়ত আমাদের ভাগ্য বলছে আমরা একসঙ্গে বাস করতে পারব না।...তাছাড়া এ জীবন আর ভাল লাগছে না। সন্ন্যাস নেব ভাবছি।'

টানি অবাক হয়ে গেল। বলল—'পেঙকাকা আমি তা কোন মতেই হতে দেব না।'...

যে দিন লাওপেঙ টানিকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয় সেই দিন হতেই টানি জানতে পেরেছিল যে লাওপেঙ তাকে ভালবাসে। উভয়েই এ বিষয়ে সচেতন ছিল। বাইরে স্বাভাবিক ভাব দেখাত দুজনেই কিন্তু মনে মনে কেউ নিজেকে গোপন করতে পারে নি।

পরদিনই লাওপেঙ অন্য এক হোটেলে চলে গেল। কারণ দেখাল যে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। আসলে কিন্তু তার মন শুধু এই কথাই বলছিল যে টানির কাছ থেকে যতশীঘ্র পার চলে যাও, আর নয়।

পরের চিঠিতে টানি পোয়ার কাছে লাওপেঙের এই পরিবর্তন,—তার বিমর্ষভাব—অন্য হোটেলে চলে যাওয়া—সে যে তাকে এড়িয়ে চলতে চায় সব কিছুই লিখল।

কয়েকদিন বাদে পোয়ার চিঠি এল।

স্নেহের লায়েনারা,—

তোমার চিঠি পেয়েছি। মে মাস নাগাদ হাঙকোয় এসে পৌছাব। বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নামিওতে গিয়েছিলাম। নামিওতে বহু ভিখারি এসে জমেছে। বেলা এগারটার সময় সাইরেন বেজে উঠল। কয়েকমিনিটের মধ্যে প্লেনগুলি মাথার উপর এসে গেল। যে যেদিকে পারছে ছোটাছুটি করছে আশ্রয়ের আশায়। রাস্তাগুলি সরু। বোমা ও মেসিনগানের গুলি বর্ষণ হতে লাগল। কাজ শেষ করে প্লেনগুলি চলে গেল। চারিদিকে আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনের রোল—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মাংসপিণ্ড। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম। তুমি হয়ত এর আগে অনেকবার দেখেছ। অসহায় তীর্থযাত্রী, আবালবৃদ্ধ বনিতাকে এইভাবে হত্যা করার কোন সামরিক উদ্দেশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ শ্রমীরা এসেই আহতদের সেবা করতে

লাগল। অহিংসার মন্ত্রের ঋষি বুদ্ধের জন্মদিনে এই হল সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।

এর কি পরিণতি জান? এইভাবে অসহায় অসামরিক নরনারীদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ জাপানীদের মৃত্যু ডেকে আনবে। পঁয়তাল্লিশ কোটি লোকের ঘৃণা ও বিদ্বেষ শত্রুদের পরাজয় করতে আমাদের অনুপ্রেরণা দেবে। একদিক দিয়ে এর ফল ভালই। তবে সে দিন এখনও আসে নি। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশের লোক যেভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ সহ্য করেছে—জাপানীদের এই আক্রমণও ঠিক সেইভাবে সহ্য করতে পারে।···ইতি—তোমার পোয়া।

টানি চিঠিখানা হ্যাণ্ডব্যাগে পুরে বেরুল লাওপেঙের সঙ্গে দেখা করতে। পথে চিউ ও মিস্ টেইনকে সঙ্গে করে নিল। মিস্ টেইন টানির নতুন বন্ধু। মেয়েটি মাদাম চিয়াং-ওয়ার এরিয়া-সার্ভিস-কোরএ যোগ দিয়েছে। সহরে কয়েকদিন হল প্রায় পাঁচশ নারী সৈন্য এসেছে। নারী স্বেচ্ছাসেবিকা অনেকেই দেখেছিল কিন্তু নারী সৈন্য বাহিনী এই প্রথম। এই বাহিনী গঠন করতে গভর্ণমেণ্টকে কোন বাধ্যতামূলক আইন জারী করতে হয় নি। সাধারণ লোকের মধ্যে এই নারী সৈন্যবাহিনী বেশ একটা সাড়া এনে দিয়েছে।

লাওপেঙ তার ঘরে চুপ করে বসে আছে। পোয়ার এখানে আসবার সংবাদ ও তার টেলিগ্রামটা বড়ই অপ্রত্যাশিত। এই একটিমাত্র সংবাদ আজ তার জীবনকে পরিবর্তিত করে দিতে চলেছে। যে দিন সে বুঝেছিল টানিকে বিয়ে করতে পারবে সেইদিন থেকে অনেক আশা আকাঙ্খা ও ভবিষ্যত স্বপ্ন তার মনে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছিল। কতরাত দুজনে মুখোমুখি বসে বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিয়ে আলোচনা করেছে।··· যখন সে যুমির ছেলেটাকে নিয়ে তার ঘরে লালনপালন করছিল তখন

থেকেই তার মানসিক সাম্য নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে! মৃত শিশুটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে পরস্পর পরস্পারের দিকে চেয়ে তারা বুঝেছিল যে উভয়ে উভয়কে ভালবাসে।

লাওপেঙের পক্ষে এ জিনিষ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এতদিন বৌদ্ধশাস্ত্র নাড়াচাড়া করে সে যে নিষ্কাম প্রেমের কথা জেনেছিল তা যেন ভুল বলে মনে হচ্ছে। একজনকে একেবারেই নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা বোধ হয় যায় না।—সবই অদৃষ্টের পরিহাস।

নিজেকেই নিজের ভয়। তাই আজ লাওপেঙ টানির কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চায়। কিন্তু মন লাগামের বাইরে—অধীরভাবে সে প্রতীক্ষা করছে কখন টানি আসবে, কখন সে তার কথা শুনতে পাবে, কখন তার হাসিমুখখানা দেখতে পাবে।

টানি আসতেই লাওপেঙ সাদরে অভ্যর্থনা করল তাকে। লাওপেঙের সঙ্গে টেইনের আলাপ করিয়ে দিল টানি। টেইন বেশীক্ষণ বসল না, হাতে কাজ ছিল বলে তাড়াতাড়ি চলে এল। টানি পোয়ার চিঠিখানা লাওপেঙকে দিল। চিঠিখানা পড়ে ফেরৎ দেবার সময় লাওপেঙ বলল—'পোয়া ঠিকই লিখেছে—এইভাবে অসহায় অসামরিক নরনারী ও শিশুদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণই জাপানীদের মৃত্যু ডেকে আনবে।'

টানি হেসে জিজ্ঞাসা করল—'আপনি কি স্থির করলেন? এখনও কি সন্ন্যাসী হতে চান?'

লাওপেঙ হেসে উত্তর দিল—'তা আর কি করে হই বল! এখন তো সন্ন্যাসীরাই আসছে আমাদের মধ্যে কাজ করবার জন্য।' একটু থেমে আবার বলল—'তবে বহু কাজ করবার আছে। পিপিঙ থেকে ডাক্তার চো সস্ত্রীক এসেছেন। আহত সৈন্যদের জন্য তিনি নিজের খরচে একটা হাসপাতাল খুলবেন। তাছাড়া আমাদের গ্র্যাণ্ড মা চাও ও এখন এই সহরে। গেরিলা বাহিনীর জন্য অর্থসংগ্রহ করতে

তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। গেরিলাদের কার্য্যকলাপ জানবার জন্য আমাকে সঙ্গে করে পার্ব্বত্যাঞ্চলে নিয়ে যেতে চান। আমি তাঁর সঙ্গেও যেতে পারি।'

'কতদিনের জন্য যাবেন?'

'অল্পদিনের জন্য। তাছাড়া স্থান পরিবর্ত্তনও তো হবে।...তোমার দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। এখানে তো তোমার বন্ধুবান্ধব অনেকই হয়েছে। চিউ আছে, দরকার হলে সে তোমার কাছে থাকবে।' এই বলে লাওপেঙ চিউর দিকে তাকালে। চিউ ও তার সম্মতি জানাল।

চকিতে টানি লাওপেঙের দিকে তাকাতে উভয়ের দৃষ্টিবিনিময় হল।

কিছুক্ষণ বাদে—'আজ তা হলে আসি।' এই কথা বলে টানি ও চিউ উঠে পড়ল। টানি ঠিক বুঝতে পারল না কেন লাওপেঙ সরে যেতে চায়।

টানি চলে যেতে লাওপেঙ একাই বসে রইল। নানা চিন্তা জট পাকিয়ে আসছে তার মাথায়। টানি পোয়াকে ভালবাসে, সে ভালবাসা অতীব স্বচ্ছ এবং গভীর। লাওপেঙের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তা পোয়ার সঙ্গে বিয়ে হবার পরও অটুট থাকতে পারে—কিন্তু...।

অতীতের কত সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রুমাখা দিন আজ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। পশ্চিমের পাহাড়ে গাছতলায় বসে টানি অকপটে তার জীবনের সব কথা বলে চলেছে...পুরুষের বেশে টানি গাধার পিঠে চলেছে...টিয়েনৎসিনের হোটেলের সেই রাত্রি...টানি এসে সোফার উপর বসে পড়ল...যুমির মৃত শিশুটির সম্মুখে টানি হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে...। একের পর এক স্মৃতিমাখা দৃশ্যগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। টানির চলনভঙ্গী, টানির গলার স্বর—কথা বলতে বলতে টানি যে ভঙ্গীতে ঠোঁট কামড়ায় সবই যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

টানিকে তার কোন ভয় নেই, ভয় নিজেকে—নিজেকেই বিশ্বাস করা যায় না। সরে যেতে হবে। টানিকে না দেখতে পাওয়াই তার মঙ্গল। সহস্র কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হবে—টানিকে ভুলে থাকতে হবে তার।

॥ ১৫ ॥

পোয়া কেইলিনে চলে গিয়েছে। প্রায় দশ দিন হল কোন চিঠিপত্র দেয় নি। টানি প্রত্যহই একবার করে লাওপেঙের কাছে যায়। সারাদিন সে নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। চিউ ও টেইনের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। একদিন রাত্রে থিয়েটার দেখে ফিরবার পথে তারা লাওপেঙের সঙ্গে দেখা করতে গেল। লাওপেঙ তখন মদ খেয়ে নেশার ঘোরে টেবিলের সম্মুখে ঝিম ধরে বসে আছে। লাওপেঙকে এই অবস্থায় দেখে তারা ফিরে এল।

কয়েকদিন বাদে লাওপেঙকে বাঙসানের আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে আসতে হল। কফিনওয়ালা ঘরটায় যে বৃদ্ধা বাস করত সে লাওপেঙকে দেখতে চায়—তার নাকি কিছু বলবার আছে। লাওপেঙকে দেখে বৃদ্ধা ভারী খুসী। তখন সে বিছানায় শুয়ে ছিল। লাওপেঙকে বলল—'শুনলাম আপনি দূরে চলে যাচ্ছেন তাই দেখবার জন্য ডেকেছিলাম।'

এই বলে সে বালিসের পাশ থেকে একটা মোড়ক নিয়ে লাওপেঙের হাতে দিয়ে বলল—'এর মধ্যে তিন শ' ডলার আছে' আমার সারাজীবনের সঞ্চয়। আমায় একটা কফিন কিনে দেবেন?'

লাওপেঙ উত্তর দিল—'এত তাড়াতাড়ি কিসের?'

'না, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমার ছেলের আশা আমি

ত্যাগ করেছি। এখন···এখন···আপনি আমায় একটা ভাল দেখে কফিন কিনে দেন, আমি দেখে শান্তিতে মরতে পারব।'

'লাওপেঙ দেখল নোটগুলি বহুদিন আগেকার। আজকাল চলে না। বৃদ্ধাকে আর বলল না সে কথা। জিজ্ঞাসা করল—'তোমার ছেলের নাম কি, বয়স কত?'

'নাম চেন্ সান্। কোথায় যে সে আছে জানি না। তার বয়স তখন ষোল বছর, যেবার মাঞ্চুরিয়া গেল, সেইবার বিপ্লবীরা আমার ছেলেকে নিয়ে যায়। এখন তার বয়স চল্লিশের ওপর। হয়ত সে ছেলেপিলে নিয়ে কোথাও ঘর সংসার করছে—হয়ত বা বেঁচে নেই। এই টাকা আমি তার জন্যই রেখেছিলাম। যদি কোনদিন সে আসে তাকে আমার কথা বলবেন। অনেকদিন আগে তার জন্য পিপিঙের আও পরিবারের সেজমেয়ের কাছে কিছু কাপড় চোপড় রেখে এসেছিলাম।···'

'পিপিঙের কোন আও পরিবার?'

'তারা প্রিন্সেস গার্ডেনে বাস করত। আমি সেখানে কাজ করতাম।'

'কতদিন আগে?'

'তা কুড়ি বছর আগে।' আর কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না তার।

এদের কথা লাওপেঙ পোয়ার কাছে শুনেছিল। এক বছর আগেও চেনসানের সঙ্গে পেঙের দেখা হয়েছে। সে মফ্‌কোকে বিয়ে করেছে। তবে এখন কোথায় তা তার জানা নেই। এইটুকু জানে যে সামসি গেরিলা বাহিনীতে ছিল চেনসান। লাওপেঙ আস্তে আস্তে সব কথা টানিকে বলল। লাওপেঙের পরামর্শ মত টানি বৃদ্ধার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—'তোমার ছেলেকে পাওয়া যাবে। পেঙ-কাকার সঙ্গে কিছুদিন আগেও তাঁর দেখা হয়েছিল। তাছাড়া আও

পরিবারের সকলকেই আমরা চিনি। তোমার ছেলেকে আমরা যেমন করে পারি নিয়ে আসব।'

আনন্দে বৃদ্ধার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে আবার শক্তি ফিরে পেতে লাগল। তার কথামত লাওপেঙ কফিন আনাল। কফিনটি বৃদ্ধার বেশ পছন্দমতই হল।

* * *

একদিন টানি পিনপিনকে দেখতে যেয়ে দেখল পিনপিন বসে বসে তার ভাইকে নামতা শেখাচ্ছে। একটু তিরস্কারের সুরেই টানি পিন-পিনকে বলল—'তুমি কি চুপ করে বিশ্রাম করতে পার না? একটু ঘুমাও।'

'না আজ সকালে অনেক সময় ঘুমিয়েছি। আপনি বসুন একটু গল্প করি। টানি বসলে পিনপিনের ভাই উঠে খেলা করতে গেল। পিনপিন টানিকে বলল—'যুদ্ধ থেমে গেলে আপনি আমাদের বাড়িতে যাবেন তো? আমরা অবশ্য গরীব,...আপনার কিন্তু যেতে হবে। বাড়ীর সঙ্গে একটা বাগান, তার সামনেই ইয়াংৎসী নদী। নদীর মধ্যে চড়া পড়ে একটা দ্বীপ হয়েছে। সেখানে অনেক গাছপালা—আমরা সেখানেই খেলা করতে যেতাম।'

'আচ্ছা তোমার মা কোথায়?'

'মা মারা গেছেন, আমার ছোট ভাই হবার পরই।...আচ্ছা আপনার কি মনে হয়? আমি বাঁচব না?'

'সে কি? ও কথা কেন। তুমি সেরে উঠবে, বড় হবে, সুন্দরী হবে...। হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করছো কেন?'

'না এমনিই। সকালে কফিন এল দেখে আমার কেমন ভয় হল।'

'ও কফিন এল সেই বৃদ্ধার জন্য। না ওসব বাজে কথা ভাবতে আছে, তুমি এখন ছেলেমানুষ। এস এখন ধাঁধাঁটা নিয়ে একটু খেলা যাক্।'

খেলতে খেলতে পিনপিন বলতে লাগল—'আমার ইচ্ছে করে তাড়াতাড়ি সেরে উঠি। বড় হব আপনার মত···অবশ্য আপনার মত সুন্দর হব না, তারপর ধাত্রীর কাজ করব···বিয়ে থাওয়া করব না।···'

'তুমি তো দেখছি অনেক কিছুই ভেবে স্থির করে ফেলেছ।' হেসে টানি বলল। 'যখন বড় হবে, সুন্দরী হবে তখন দেখবে কেউ তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে। সে তোমায় বিয়ে করতে চাইলে তখন কি করবে?'

'আমি বিয়ে করব না।'

'সেটা অন্যায় হবে।'

'আমি এরকম গল্প শুনেছি। যদি কোন লোক কোন মেয়েকে ভালবাসে তা হলে তাকে দেখতে না পেলে পর্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে, মরতে চায়; আবার দেখতে পেলেই সব ঠিক! একি সত্যি?'

টানি জানত লাওপেঙ পাশের ঘরেই বসে আছে এবং তাদের সমস্ত কথাই শুনতে পাচ্ছে। একটু সলজ্জ ভাবে সে উত্তর দিল—'বোধহয় সত্যি, তাতে যদি মেয়েটি খুব সুন্দর হয় এবং ছেলেটি খুব ভালবাসে তা হলে হতেও পারে।'

পরদিন সকালবেলায় যুমি এসে খবর দিল যে একজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। টানি বাইরে বেরিয়ে এল। ভদ্রমহিলার ঠোঁটের কোনে বাঁকা হাসি, কথায় পিপিঙের টান। ভদ্রমহিলা বললেন—'এইভাবে কোন খবর না দিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসায় আমি নিজেই লজ্জিত কিন্তু পোয়ার টেলিগ্রাম পেয়ে না এসে পারলাম না। আপনিই কি মিস্ পেঙ? আমি পোয়ার মেজ কাকীমা, আর এটি আমার ছেলে আটাঙ।'

'ওঃ আপনিই তার কাকীমা মুলান। আমি স্বপ্নেও ধারণা করতে পারি নি যে···।' এই বলে টানি তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বসাল।

'আমি কাল রাত্রে টেলিগ্রামখানা পেয়েছি।' এই বলে মুলান টেলিগ্রামখানা টানিকে দেখাল। পোয়া জানিয়েছে—'হাঙসানে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে মিস্ টানি পেঙের সঙ্গে দেখা কর। চেনসানের মাও সেখানে আছে। যদি পার তো চেনসানের ঠিকানা জোগাড় করতে তাদের সাহায্য কর। মিস্ পেঙকে নিজের আত্মীয় বলে মন করবে। তোমার বাড়ীতে তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবে। দিব্যি থাকল। তাকে মেনে নিতে পারলে তাকে চিনতে পারবে। —পোয়া।'

মুলান লক্ষ্য করল টেলিগ্রামখানা পড়তে পড়তে টানি আরক্তিম হয়ে উঠল, টানিও বুঝল যে মুলানের নজর সে এড়াতে পারে নি। টানি লাওপেঙকে ও বৃদ্ধাকে খবর দিল। সকলে মিলে ধরাধরি করে বৃদ্ধাকে সেখানে নিয়ে এল। মুলান তাড়াতাড়ি উঠে তাকে ধরে নিজের পাশে বসাল। মুলান বৃদ্ধাকে বলল—'চিনতে পার আমি আও পরিবারের মেজ মেয়ে মুলান?'

বৃদ্ধা ভুরু তুলে মুলানকে দেখল। তার মুখ দিয়ে কথা সরল না— দু' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। মুলানেরও চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। বৃদ্ধার জীবনের অনেক কিছুই সে জানে। মুলান ধীরে ধীরে তাকে তার ছেলে কোথায় আছে, কবে বিয়ে করেছে, কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সব বলল। এও বলল যে তার ছেলেকে সে টেলিগ্রাম করে দেবে তাহলে দু' সপ্তাহের মধ্যেই সে এসে পৌছাবে। তারপর বৃদ্ধাকে সে তার বাড়ীতে যেয়ে বাস করতে বলল, কিন্তু বৃদ্ধা রাজি হল না। পরে টানি বৃদ্ধার এখানে আসা, কফিনওয়ালা ঘরে থাকা, নিজের কফিন কিনিয়ে আনার কথা সব জানাল। মুলান টানিকে বলল—'যদি পারেন কোন রকমে বুঝিয়ে ওকে ঐ ঘর থেকে সরান, ওর ছেলে এসে ওকে ঐখানে দেখলে হয়ত কিছু ভাবতে পারে।'

শেষপর্য্যন্ত কয়েক দিন পরে অনেক করে বুঝিয়ে বৃদ্ধাকে মুলানের বাড়ীতে থাকবার জন্য নিয়ে যাওয়া হল।

ইতিমধ্যে টানি লাওপেঙ যুমি প্রভৃতির সঙ্গে মুলানের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। মুলানের বাড়ীতে টানির যথেষ্ট আদর। সকলেই তাকে আত্মীয়ের মত দেখে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মুলান টানির কাছে পোয়ার কথা তুলে বলল—'তুমি আমায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পার। সমস্ত কথা খুলে বল। দরকার হলে আমি তোমায় সাহায্য করতে পারব।

টানি ধীরে ধীরে তার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্তই মুলানকে জানাল। সমস্ত শুনে মুলান বলল—'পোয়া যদি তোমায় বিয়ে করে তা হলে…?'

টানি উত্তর দিল—'কিন্তু পোয়ার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা আছেন, তাঁরা হয়ত আপত্তি করবেন।'

পোয়া স্বাধীনচেতা, অন্যের কথার ধার ধারে না। তাছাড়া আত্মীয় স্বজনের মধ্যে একমাত্র আমার কথাই যা শোনে।'

সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে টানি লাওপেঙের হোটেলে গেল। মনে মনে মুলানকে শ্রদ্ধা না করে পারল না সে। কিন্তু তবুও স্থির করল যে দুটি কথা উপস্থিত মুলানকে বলবে না, একহচ্ছে যে সে নিজে অন্তঃসত্ত্বা আর—লাওপেঙের এই পরিবর্ত্তন। এই লোকটি তিলে তিলে নিজেকে বিসর্জ্জন দিচ্ছে তার জন্য।

লাওপেঙ তখনও ফেরে নি। টানি তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। লাওপেঙকে নিয়েই তার মনের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে। এমন কি হয় না যে লাওপেঙ আগেও যেমন ছিল এখনও সেই রকম থাকবে? পোয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হবার পর কেন লাওপেঙ তাদের সঙ্গে থাকবে না?…এমনি সময়ে লাওপেঙ ফিরলে নানা কথার পর টানি তাকে জিজ্ঞাসা করল—'আপনি কি সত্যই উত্তরে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। এখান থেকে হোপেই হোনানে যাব, সেখান থেকে সাককোয় যাব। সেখানে যুদ্ধ আসন্ন।'

'পোয়া খুব সম্ভব মে মাসে এখানে আসবে। আপনি কি ততদিনে ফিরবেন?'

'বোধহয় ফিরব।'

'আপনার উপস্থিত থাকা দরকার। অনেক কিছুই হবে সে সময়।'

'তোমাদের বিয়েতে নিশ্চয়ই থাকব আমি।'

* * * *

চেনসানকে যে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল তার উত্তর এসে গিয়েছে। সে সস্ত্রীক আসছে তার মাকে দেখতে। টানি টেলিগ্রামখানা নিয়ে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে লাওপেঙকে খবর দিতে গেল। তারপর দিনই লাওপেঙ এখান থেকে চলে যাবে।

সমস্ত কিছু সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে আশ্রয়প্রার্থীশিবির চালাবার টাকার ব্যবস্থা করে লাওপেঙ তার পরদিন গ্র্যাণ্ড মা চাওএর সঙ্গে যাত্রা করল। বহুলোক তাদেরকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে এল। টানি লাওপেঙকে গিয়ে সংবাদ দেবার জন্য ও নিয়মিত চিঠি লিখবার জন্য বারবার অনুরোধ জানাল।

* * * *

হঠাৎ যেন টানির আজ নিজেকে একেবারে নিঃসঙ্গ বলে মনে হতে লাগল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসায় ফিরল সে। ফিরতেই চিউ এসে খবর যে দিল যে পিনপিনের অবস্থা ভাল নয়। টানি জিজ্ঞাসা করল—'ইন্জেকসনে কোন ফল হল না?'

'না, গ্লুকোজ ইনজেকসন তো দেওয়া হয়েছিল। তবে আমেরিকা থেকে একটা নতুন ওষুধ এসেছে, দিয়ে দেখতে পারলে হত। কিন্তু বেজায় দাম, প্রায় কুড়ি পঁচিশ ডলার প্রতি মাত্রায়।'

'তা হোক, সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।' এই বলে টানি চিউর সঙ্গে পিনপিনকে দেখতে গেল। পিনপিনের বাবা টানিকে দেখে কেঁদে ফেলল। টানি পিনপিনের বিছানার পাশে বসে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিল। পিনপিন টানির মুখের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল—'সত্যি করে বলুন তো আমি আর বাঁচব কিনা ?'

'নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। একটা নতুন ওষুধ এসেছে, সেটা দিলেই দেখবে তুমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।'

'তার দাম নিশ্চয়ই খুব বেশী ? কত দাম ?'

'তোমাকে তার জন্য ভাবতে হবে না। তোমাকে সারিয়ে তুলবই।'

'হ্যাঁ আমি সেরে উঠব, বড় হব,...আবার পড়ব, পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। আমি যদি সেরে উঠি...।'

পিনপিনের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। টানি বলল—'তুমি এখন আর বেশী কথা বল না, ঘুমাও।'

'না, আমার মনে যা আছে আপনাকে সব বলব। যুদ্ধ থেমে গেলে আপনি আমাদের বাড়ী যাবেন। আপনার খাওয়ার...।'

'সে হবে। সেরে ওঠ তারপর সব হবে। ওষুধ কালই এসে যাবে।' টানির কান্না পাচ্ছিল। কান্নার বেগ চাপবার জন্য সে ঠোট কামড়ে ধরল। পিনপিনের লক্ষ্য এড়াল না তা।

'আপনি কাঁদছেন কেন ?'

'না, তুমি ঘুমোও দিকি।'

'আমার যা বলবার ছিল বলেছি।' এই বলে পিনপিন চোখ বুজল।

পরদিন ওষুধ এসে গেল। ওষুধটি যাদুমন্ত্রের মত কাজ করল। তিন দিনের মধ্যেই দেখা গেল রোগীর অবস্থা বেশ উন্নতির দিকে।

*   *   *   *

লাওপেঙ চলে যাবার সাতদিন পরে জাপানীরা হাঙকো ও উচাঙে বোমা ফেলল।

সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে জঙ্গলে ও বাগানের দিকে ছুটলো আশ্রয় লাভের জন্য। পিনপিনের বাবা বরাবরই ছেলেমেয়েদের নিয়ে সর্বাগ্রে আশ্রয় নেন। চিউ তাকে জানিয়ে দিল যে এ অবস্থায় পিনপিনের নড়াচড়া করা চলবে না। কাজেই পিনপিনকে নিয়ে তার বাবা বাড়ীতেই রয়ে গেল। বেলা দুটোর সময় ৭০ খানা প্লেন বোমা ফেলতে আরম্ভ করল। বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো গর্জন করতে সুরু করল। পিন্‌পিন যে বাড়ীতে ছিল তার প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা বোমা পড়ল। ভীষণ এক বিস্ফোরণে বাড়ীটা কেঁপে উঠল, শার্সীগুলি ঝন্ ঝন্ করে ভেঙ্গে পডল, ঘরের ভিতরের চুণ বালি খসে পড়ল, সমস্ত বাড়ীটা ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল। পিনপিন ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে শুয়ে রইল। তার বাবা হাত দিয়ে মেয়ের কান ঢেকে রেখেছে। যখন ঘরের চুণবালি খসে পড়ল পিন্‌পিনের বাবা আর স্থির থাকতে পারল না। মেয়েকে কোলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলের দিকে। ভয়ে তার সর্বশরীর কাঁপছিল। যেতে যেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল একবার। কোন রকমে হাত দিয়ে মেয়েকে বাঁচাল। আবার উঠে পিনপিনকে বুকে করে কোনরকমে জঙ্গলে প্রবেশ করে টানি ও চিউর সম্মুখে তাকে আস্তে আস্তে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল।

পিনপিনের মুখ মরার মত সাদা হয়ে গিয়েছে। ভয়ে তার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই সাইরেনে নিরাপত্তার সঙ্কেত জানিয়ে দিতে টানি ও চিউ ধরাধরি করে পিনপিনকে পুনরায় ঘরে নিয়ে এল।

বিছানায় শুয়ে পিনপিন মাঝে মাঝে চমকে ওঠে। হঠাৎ সকলের দিকে তাকিয়ে পিনপিন আস্তে আস্তে বলল—'এবার

আপনাদের ছেড়ে চললাম। এইমাত্র আমার দাদাকে দেখলাম,—আমি জানি…'

কথা শেষ হবার আগেই তার কাশি এল, মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।…সারা বিকেলটা চলল এভাবে। টানি উদ্বিগ্ন চিত্তে পাশে বসে, যেন মৃত্যুকে রোখবার প্রতীক্ষায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল। পিনপিন কি যেন বলতে চায়। টানি তাড়াতাড়ি বাতিটা তার মুখের কাছে ধরল। চারিদিকে তাকিয়ে অতি ধীরে ক্ষীণস্বরে পিনপিন বলতে লাগল—'এরা সব কি করছে…আমরা সকলেই অতিথি'…আমাদের বাড়ী…ইয়াংৎসির ধারে…আপনি কাঁদবেন না…যুদ্ধ মিটে যাবে…আবার আমরা ফিরে যাব…পড়াশুনা আরম্ভ করব।' তার চোখ দু'টো বুঁজে এল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ। আবার তাকাল, মনে হল যেন এবার মানুষ চিনবার শক্তি তার ফিরে এসেছে। বাবার দিকে চেয়ে বলল—'বাবা কাঁদবেন না…পিণ্টুকে দেখবেন…সে কোথায়?'

চিউ পিণ্টুকে নিয়ে এল। তার হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে বলল—'লক্ষ্মীছেলে হয়ে থেকো…দুষ্টুমি করো না।' টানিকে দেখিয়ে—'ইনি তোমায় নামতা শেখাবেন।' টানির দিকে চেয়ে বলল—'আপনার মুখখানা একবার দেখব।' টানি আলোটা নিজের মুখের কাছে ধরল। পিনপিন ভাল করে দেখল, একটু হেসে বলল—'আপনি বেশ সুন্দর।'

পিনপিনের চোখ বুঁজে এল। মুখের দুই কস্ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। প্রদীপশিখাটি একবার উজ্জ্বল হয়ে নিভে গেল। জানালায় একটা সাদা রুমাল ঝুলছিল বাতাসে একবার দুলে উঠল রুমালটা।

টানি আস্তে আস্তে নিথর নিস্পন্দ হাতখানা তার কোলের ওপর থেকে নামিয়ে দিল। কাঁদবার মত মনের অবস্থা ছিল না তার। যাকে

প্রাণ দিয়ে মরণের কোল থেকে ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিল, মরণ আজ অবজ্ঞাভরে উপহাস করে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। একের পর এক পিনপিনের প্রতিটি ইচ্ছা, পিনপিনের প্রতিটি কথা টানির মনের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।...সে বাঁচতে চেয়েছিল, বাড়ী ফিরে যেতে চেয়েছিল, লেখাপড়া শিখতে চেয়েছিল...। কিন্তু...! ফুলের পাঁপড়ির মত তার জীবনটুকু ঝরে পড়ল। ঝড়ের মুখে ছোট্ট একটা পাতার মত কোথায় সে উড়ে গেল। যুদ্ধ এসেছে—সঙ্গে এনেছে অভিশাপের ঘূর্ণীবাত্যা। পরদিন খবরের কাগজে বেরুবে এত লোক হত, এত লোক আহত, শত্রুদের বোমাবর্ষণ, জয়ের কীর্তি। বোমায় পিনপিন মরে নি, কিন্তু বোমা না পড়লেও সে মরত না। এই রকম কত শত জীবন ঝড়োপাতার মত অভিশাপের ঘূর্ণীবাত্যায় কোথা হতে কোথায় আসছে বা কোথায় যাচ্ছে তার কোন হিসেব নেই, তার হিসেব নির্ণয় করাও অসম্ভব। ইতিহাসের পাতায় এর কোন উল্লেখ থাকবে না। সেখানে থাকবে কত সৈন্য মরল, শত্রুরা কতজনকে মারল...সেখানে থাকবে সংগ্রামের প্রত্যক্ষ দিকটা, গৌণদিকটা নয়। আজ লাওপেঙ এখানে নেই। লাওপেঙ এখানে থাকলে হয়ত পিনপিনকে বাঁচান যেত। লাওপেঙের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই ঘটে গেল।...এই বালিকার মৃত্যু যুদ্ধের কপালে কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল।

॥ ১৬ ॥

পরদিন মুলান উদ্বিগ্নচিত্তে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে এসে হাজির। টানি তখনও ঘুমাচ্ছে। যুমি মুলানকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। যুমির সঙ্গে কথাবার্তায় মুলান টানি ও পোয়ার সম্বন্ধে জেনে নিল। টানি যে সন্তান সম্ভবা তাও জানতে তার বাকী রইল না। টানি ঘুম ভেঙ্গে যখন

জানতে পারল যে মুলান এসে বসে আছে তখন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। মুলানের কাছে এই অসময়ে ঘুমাবার জন্য বারবার অনুতাপ করতে লাগল।

কথায় কথায় মুলান তাকে বলল—'তোমার শরীর বিশেষ ভাল নয়—তার উপর এতবড় শিবিরের ভার। তুমি বরং দু'চার দিন আমার বাড়ীতে যেয়ে থাকবে, বিশ্রাম নেবে চল।'

টানি প্রথমটা আপত্তি করল, নানারকম অসুবিধার কথা তুলল—কিন্তু মুলান সে সব সমস্যার সমাধান করতে রাজি হওয়ায় টানিকে অগত্যা মুলানের প্রস্তাব মেনে নিতে হল।

মুলানের বাড়ীতে টানির বেশ ভালই লাগছিল। মুলান যে টানির সম্বন্ধে সব কিছু জানে এ কথা টানি জানত না বা মুলান ও জানবার সুযোগও দেয় নি। মুলান টানির সঙ্গে পোয়ার বিয়ের বন্দোবস্ত করছিল। এসব ব্যাপারে মুলান নানা জায়গায় টেলিগ্রাম করছিল। একদিন সুমিয়া টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছে জানতে পেরে টানি তাকে জিজ্ঞাসা করল—'কোথায় টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছ ?'

সুমিয়া হেসে উত্তর দিল—'পোয়ার কাছে।'

টানি লজ্জা পেয়ে গেল আর কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। আর একদিন শুনল যে সাংহাইএ টেলিগ্রাম করা হচ্ছে। টানি মুলানকে জিজ্ঞাসা করল—'নানা জায়গায় টেলিগ্রাম করা হচ্ছে, কি ব্যাপার ?'

মুলান হেসে বলল—'আমার পারিবারিক বিষয় তোমায় জানাব কেন ?' পরক্ষণেই একটু বাঁকা চাহনি দিয়ে বলল—'কেন বুঝতে পারছ না যে তোমারই বিয়ের উদ্যোগ করছি।'

টানির মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মুলান হেসে বলল—'এ সব সংবাদ তোমায় না দেওয়াই উচিত ছিল কিন্তু দেখলাম তুমি বড় দোটানায় পড়েছ…।'

টানি ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। সে বলল—'কিন্তু কাজটা কি এতই সোজা? তার বৌ আছে, তা ছাড়া...'

'সে সব ব্যবস্থা হয়েছে।'

* * * *

মুলানের কাছে টানির ক'দিন বেশ আনন্দেই কাটল। কিন্তু ফিরে এসে আবার সেই অবস্থা। মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই; হতাশা ও শ্রান্তির মধ্যে দিনগুলি কেটে যায়।

ইতিমধ্যে পোয়ার এবং লাওপেঙের চিঠি এসে হাজির। নিজের অজ্ঞাতসারেই টানি লাওপেঙের চিঠিখানা আগে খুলল। পোয়ার চিঠি নিতান্তই মামুলী। একবার পড়লেই ফুড়িয়ে যায়। আর লাওপেঙের চিঠি বারবার পড়লেও শেষ হয় না।

* * * *

যুদ্ধের মোড় ঘুরে গিয়েছে। লোকের ভয় ভেঙ্গে গিয়েছে। দৈনিকই সংবাদ আসছে জাপানীদের পরাজয়ের, তাদের পশ্চাদপসরণের। সহরে আবার আলো জ্বলে উঠেছে সুদীর্ঘকালের পর। লোকে এখন অনেকটা নিঃশঙ্কচিত্তে চলাফেরা করে। ছেলেমেয়েরা দলে দলে নাম লেখাচ্ছে যুদ্ধে যাবার জন্য।

ইতিমধ্যে চেনসান ও হুয়ানেরা এসে পৌছাল। বুড়ী চেনমা এতদিন বেঁচেছিল ছেলেকে দেখবার জন্য। ছেলে ও ছেলের বউ এসে পৌছালে তাদের সঙ্গে দেখা হবার পরই বুড়ী মারা গেল।

চেনমার শেষকৃত্য হয়ে যাওয়ার পর টানি বুড়ীর সেই প্যাকেটটি চেনসানের হাতে দিয়ে বলল—'আপনার মা এটা আপনাকে দেবার জন্য মিষ্টার পেঙএর কাছে রেখেছিলেন। তিনি যাবার সময় এটি আমায় দিয়ে গিয়েছেন আপনাকে দেবার জন্য।'

'কিন্তু কফিনের টাকা কে দিয়েছে?'

'মিষ্টার পেঙ। আপনার এই প্যাকেটের মধ্যে অনেকদিনের পুরানো টাকা আছে—আজকাল সেগুলি অচল। আপনি বরং মার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এগুলি রাখুন।'

...এরপর টানি চানসানকে লাওপেঙের কথা জিজ্ঞাসা করল। তার কাছে সে শুনল যে লাওপেঙ অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং চেঙ্‌কোতে একটা হোটেলে আছে।

টানি লাওপেঙের কাছে যাওয়া মনস্থ করে তাকে একখানা টেলিগ্রাম করল। তিন দিন পরে লাওপেঙের চিঠি এল। সে লিখেছে যে তার অসুখ এমন কিছু নয়। আসলে কিন্তু লাওপেঙ তখনও বিছানায় পড়ে। কয়েকদিনের মধ্যে একদল স্বেচ্ছাসেবক উত্তরে যাচ্ছিল। টানি তাদের সঙ্গেই লাওপেঙের কাছে যাবে স্থির করল। মুলান শুনে প্রথমে আপত্তি জানাল, কিন্তু টানি নাছোড়বান্দা। কাজেই মুলান শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিল।

॥ ১৮ ॥

স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে এসে টানি চেঙকোতে একটা হোটেলে উঠলো। হোটেলে নিজের একটা ব্যবস্থা করেই টানি চলল লাওপেঙের হোটেলের উদ্দেশ্যে।

লাওপেঙের হোটেলের কেরাণী টানিকে জিজ্ঞাসা করল—'তাঁকে কি বলব?'

'বলুন যে তার ভাইঝি দেখা করতে এসেছে।'

'তিনি আমাদের বলেছিলেন যে তাঁর কোন আত্মীয় স্বজন নেই।'

'পাছে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি এই ভেবে আমাদের জানান নি। বোধ হয় সেই কারণেই আপনাদেরও ওই কথা বলেছেন। তাঁর অসুখ কি বাড়াবাড়ির দিকে?'

'আজ প্রায় দশদিন হল তিনি উত্তর হতে এসেছেন। সারাদিনই তো বিছানায় থাকেন। আমি আপনাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

একজন পরিচারকা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে টানিকে উপরে নিয়ে গেল। পরিচারিকাটি লাওপেঙের দরজায় মৃদু করাঘাত করে কোন সাড়া না পেয়ে আস্তে আস্তে দরজাটি খুলল—টানি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকল। তখন ৫টা বাজে। ঘরটা প্রায় অন্ধকার, পরদাগুলি ফেলা। লাওপেঙ ঘুমাচ্ছে। টানি বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে লাওপেঙের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

একটা অব্যক্ত বেদনায় টানির বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। এর কাছে টানির কোনদিনই কোন শঙ্কা আসে নি, কোন রকম ভর্ৎসনা কোনদিন টানি এর কাছে পায়নি। টানির সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশী উপকার এই লোকটিই করেছে। আর আজ টানির জন্যই তার এই নির্বাসন দণ্ড নেওয়া।

টানি জানে যে পোয়ার আসার কথা শুনবার পর থেকেই লাওপেঙের এই পরিবর্তন। পোয়া যদি না আসত তা হলে তো এই লোকটিই তাকে বিয়ে করত। টানি খুব ভালভাবেই জানে যে লাওপেঙ তাকে ভালবাসে।

'কপালটায় হাত দিয়ে তাপটা একবার দেখলে হত, কিন্তু যদি লাওপেঙের ঘুম ভেঙে যায়!' রুমাল বের করে টানি নিজের ঘাম মুছল। সাবধানে আস্তে একবার নাক ঝাড়ল। সেই শব্দেই লাপপেঙের ঘুম ভেঙ্গে যেতে সে টানির দিকে তাকাল।

'পেঙ কাকা আমি টানি।'

লাওপেঙ বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইল। তার চোখে-মুখে বেশ একটা আনন্দের রেশ।

'টানি! কখন এলে?' সেই পরিচিত স্বর।

'এই মাত্র আসছি। আপনি আমায় জানান নি কেন?'

'অসুখ এমন কিছুই নয়। তুমি হঠাৎ এলে, কি ব্যাপার?'

টানির চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছিল তবুও টানি হেসে বলল—

'আপনাকে দেখতে।'

টানির চোখে জল দেখে লাওপেঙ মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল।

'কেন, আমি তো ভালই আছি লিখেছিলাম। আমার চিঠি পাওনি?'

'পেয়েছি।...আপনাকে দেখাশুনা করবার জন্য এখানে তো কেউই নেই দেখছি।'

'না। এমন কিছুই নয়, সামান্য ঠাণ্ডা লেগেছে মাত্র।'

'কি ওষুধ খাচ্ছেন?'

'কিছুই না কেবল চা ছাড়া। দু'এক দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'আপনি একা এখানে চলে এলেন কেন?' টানির কথায় তিরস্কারের সুর ফুটে উঠল।

লাওপেঙ টানিকে আলোটা জ্বালাতে বলল। আলো জ্বাললে লাওপেঙ টানিকে ভাল করে দেখল। নিতান্ত সাধাসিধে পোষাক, কোন রকম আড়ম্বর নেই।

'টানি তুমি দেখতে সেই রকমটিই আছ।'

টানি লজ্জা পেল।

'পেঙ কাকা আমাকে আসতে হয়েছে অনেক কারণে। আপনি চলে আসবার পর কত কি ঘটে গেল। শিবিরে বোমা পড়েছিল। সেই সময় পিনপিন মারা যায়। চেনমা মারা গিয়েছে।'

টানি সবিস্তারে সব সংবাদ দিল। পোয়ার আসার খবরও দিল।

'পোয়া কবে আসছে? চিঠিতে কি লিখেছে?'

'নতুন কিছুই লেখে নি।'

'তুমি কি তোমার অবস্থার কথা লিখেছ?'

টানি ঈষৎ লজ্জিত হয়ে মুখখানা অবনত করল।

'না।…সে যা লেখে! ছাইভস্ম—পড়তে ভাল লাগে না—কোন পাহাড় কত উঁচু—strategy—!'

'কবে সাক্কোতে ফিরছ?'

'তারা কালই ফিরবে। আমি যাচ্ছি না এখন।…সত্যি কথা বলতে কি আমি আপনাকে দেখতে এসেছিলাম।'

কথাগুলো বলবার সময়ে লাওপেঙের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতে টানির কান দুটো লাল হয়ে উঠল। সেই আগের চাহনি—অনেকদিন আগে যখন লাওপেঙ বলেছিল পোয়া যদি না আসে তা হলে আর তোমার আপত্তি না থাকলে তোমার ছেলের নাম আমার পদবী অনুসারেই রেখ। টানি মুখ ঘুরিয়ে নিল—তার অস্বস্তি লাগছিল। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য সে লাওপেঙের জামা-কাপড়গুলি গোছাতে গোছাতে বলল—'এগুলি কেচে আনার পর এভাবে ফেলে রেখে ময়লা করছেন কেন?'

'কোথায় রাখব? তা ছাড়া এখানে শুয়ে শুয়ে হাতের কাছেই পাওয়া যায়।…কিছু খাবে তুমি?'

টানি সম্মতি জানালে লাওপেঙ পরিচারিকাকে ডেকে খাবার আনতে বলল। টানি উঠে আস্তে আস্তে পরদাটা সরিয়ে জানালার গরাদ ধরে বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল।

বাইরে তখন গোধূলি। ক্রমেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। টানির মূর্তিটা একটা ছায়ার মত দেখাচ্ছিল। নিবিষ্টচিত্তে সেই দিকে তাকিয়ে লাওপেঙের মনের কোন এক অজ্ঞাত স্তর হতে যেন একটা কথাই বেরিয়ে

আসছে—এই মেয়েটির জীবন তার সঙ্গে বাঁধা হয়ে গিয়েছে—ভবিতব্য যাই হোক না কেন সে বাঁধন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে যাবে। মনের কোন্ সে অজ্ঞাত অবোধ্য স্তর হতে এই আপাত অসংলগ্নতার উদয় তা লাওপেঙ বুঝতে পারল না।

খাবার আসতে টানি খেয়ে হাত ধুয়ে একটা সবুজ কাগজ দিয়ে আলোটা মুড়ে দিল। লাওপেঙ এতক্ষণ টানিকে দেখছিল। আলোটা ঢাকা হলে টানি লাওপেঙকে জিজ্ঞাসা করল—'এবার ঠিক হয়েছে, চোখে লাগছে না তো?' লাওপেঙ সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বললে—

'তুমি কেন এলে?' লাওপেঙের কথায় অভিযোগ ফুটে উঠল। টানি কোন উত্তর না দিয়ে মুখ নীচু করল।

চাকর চা নিয়ে এল। টানি দু' কাপ চা ঢেলে এক কাপ লাওপেঙকে দিতে গিয়ে বলল—

'আমার উপর রাগ করবেন না।'

'না তোমার উপর রাগ করিনি, বরঞ্চ তুমি আসাতে আনন্দিতই হয়েছি।'

তারপর খানিকক্ষণ নীরবে কাটল। টানিই প্রথম সেই অস্বস্তিকর আবহাওয়া কাটিয়ে বলল—

'পোয়ার কাকীমা এসেই বিয়ের ব্যবস্থা করাতে লেগে গিয়েছে। কাইনানের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের সব ব্যবস্থাও করে ফেলেছে সে।'

মুহূর্তের জন্য লাওপেঙ নীরব থেকে বলল—'শুনে সুখী হলাম, বিয়েতে যাবার চেষ্টা করব।'

মাথা নীচু করে, আঙুলে একটা সুতো জড়াতে জড়াতে টানি আস্তে আস্তে বলল—'আপনি কেন হাঙকো থেকে চলে এলেন?'

টানির দিকে না তাকিয়েই লাওপেঙ উত্তর দিল—

'যুদ্ধের স্বরূপ দেখবার জন্য।'

'না তা নয়। আমি জানি আসল কারণ অন্য।'

'তা হলে কি?'

'বলতে কোন বাধা নেই। পোয়ার ফিরে আসবার সংবাদ শুনে আপনি ইচ্ছে করেই হাঙ্‌সান হতে চলে এলেন আমাকে এড়াবার জন্য। বলুন, আপনিই বলুন···।'

লাওপেঙ টানির মুখের দিকে চাইল।···টানির চোখে কিসের এক উন্মত্ততা।···

'টানি থাক্।'

'না,—আমাদের পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি এই কৃচ্ছ্রসাধন করে যাচ্ছেন আমাকে এড়াবার জন্য। যাতে পোয়া আমায় বিয়ে করতে পারে। সেই রাত্রেই আমি দেখেছিলাম আপনি একা একা মদ খেয়ে চলেছেন নিজেকে ভুলাবার জন্য।······আমি শান্তি পাচ্ছি না।······আপনি আমায় ভালবাসেন?'

'ও কথা কেন আমার মুখ থেকে শুনতে চাও!'

'কারণ আমি আপনাকে ভালবাসি। আপনি আমায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন—আমিও তাই চেয়েছিলাম। তারপরই পোয়ার চিঠি এল আর আপনি···।'

টানির কথা শুনে লাওপেঙ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। টানির লক্ষ্যই ছিল না সেদিকে। সে বলে চললো—'আগে আমি বুঝতে পারি নি··· ভেবেছিলাম আমি ভালবাসি।'

'ঠিকই ভেবেছিলে। তুমি তাকে বিয়ে কর।'

'না। আজ আমাদের মধ্যে একটা বুঝাপড়া হোক্, তারপর ওসব ভাবা যাবে।'

'টানি।' লাওপেঙের গলা কাঁপছিল—'আমি স্বীকার করি যে তোমাকে পাবার এক দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আমার হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি! পোয়া আমার বন্ধু।···তুমি আমার কষ্ট দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছ। আসলে তুমি তোমার নিজের মনকেই চেন না। এই সব সাময়িক উত্তেজনার কথা ভুলে যাও। এখনকার এই ঘটনার জন্য ভবিষ্যতে হয়ত তুমি নিজেই লজ্জা পাবে।'

'ও পেঙ্‌—আমি বোকা নই, আমি বুঝি আমি কি বলছি।'

'না, এ তোমার অন্যায়। পোয়া আমার বন্ধু। তোমরা উভয়েই অল্পবয়সী। সে তোমায় ভালবাসে—তুমি তাকে ভালভাবেই জান।'

'না আমি তাকে জানি না, বুঝি না। আমি তোমাকেই বুঝি। পোয়া আমায় ভালবাসে না, ভালবাসে আমার দেহকে। সে আমার কাছে কি চায়—আমি জানি, কিন্তু আমি তাতে রাজি নই।' এই বলেই টানি কেঁদে ফেলল। লাওপেঙ তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

'আমি অসুস্থ—তার ওপরে তুমি আমায় আরো চঞ্চল করে তুলছ।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। হঠাৎ লাওপেঙের হাতখানা টানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ঠোটের কাছে তুলে ধরল।

* * *

হাঙকোতে এসে পোয়া সোজা মুলানের সঙ্গে দেখা করল। সমস্ত সংবাদই পোয়া মুলানের কাছে পেল। পোয়া মুলানকে জিজ্ঞাসা করল—'এ বিয়ে সম্বন্ধে টানির কি মত?' মুলান বলল—'সোজাসুজি কোন কথা তো হয় নি, তবে যুমির কথায় বুঝেছি তার মত আছে।'

পোয়া যুমির সঙ্গেও দেখা করল। যুমি প্রথমে কিছুই বলতে চায় না। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে সে কিছু কিছু জানতে পারল। টানি অন্তঃস্বত্বা এবং পোয়া সময় মত না এলে লাওপেঙ যে তাকে বিয়ে করে

লজ্জার হাত হতে বাঁচতে তা-ও জানতে পারল। এ কথায় পোয়ার যেন সব ঘুলিয়ে গেল। পোয়া আর এখানে অপেক্ষা না করেই সাকৃকোতে রওনা হল। যাবার আগে মুলানকে কাইনানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করতে বলে গেল। আরও জানিয়ে গেল, বিয়েতে একটু দেরী হতে পারে, সে না ফেরা পর্য্যন্ত যেন বিয়ের কোন ব্যবস্থা না করে।

৩রা মে পোয়া সাকৃকোতে পৌছাল। পোয়ার টেলিগ্রাম পাবার পরই লাওপেঙ টানিকে বলেছিল—'পোয়ার সঙ্গে কোনরকম ঝগড়া করবে না—ভাল ব্যবহার করবে।'

টানি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ঝাঁঝিয়ে বলে উঠেছিল—'না—তা আমি পারব না। সে আসুক আর না আসুক তাতে আমার কিছু এসে যায় না—আমি তোমায় ভালবাসি।'

লাওপেঙ উত্তরে বলেছিল—'টানি, প্রেমের মধ্যে স্বার্থপরতা টেনে এনো না। তোমার সঙ্গে যদি পোয়ার বিয়ে হয় তা হলে আমি সুখীই হবো আর যদি বিয়ে না হয় তাহলে পোয়া অসুখী হবে। তুমি শুধু তোমার নিজের কথাই ভাবছ।'

'হ্যাঁ তাই ভাবছি, তাই-ই ভাবব। তাকে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট হতে পারব না। জানি সে আমায় বিয়ে করবে, মনের মত করে সাজাবে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমায় নিয়ে দেখাবে, অজস্র টাকা পয়সা আমার পেছনে খরচ করবে, কিন্তু আমি তা চাই না। সে সব মালিন চাইত—টানি চায় না,—না। মালিন মরে গিয়েছে—এ তোমার টানি, তুমি একে তৈরী করেছ। ও পেঙ…।'

'তোমায় এ পেঙ বলে ডাকা বাদ দিতে হবে। পোয়ার সামনে তুমি আমায় পেঙকাকা বলে ডাকবে।'

'না ডাকব না।'

'টানি আমায় আর ভুগিও না। তোমায় আমি বিয়ে করতে পারি না। পোয়ার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর, তাকে বিয়ে কর।'

এতক্ষণে টানি পরাজয় মানল।

'আচ্ছা তাকেই বিয়ে করব, কিন্তু তোমাকেই আমি আজীবন ভালবাসব।'

* * * *

সারাটি দিন বৃষ্টি হচ্ছিল। লাওপেঙ ও টানি ষ্টেশনে গিয়েছিল পোয়াকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। ষ্টেশনে টানি পোয়ার সঙ্গে আগের মতই ব্যবহার করল। তিনজনে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে রিকসায় উঠল।

'সেফাঙসানটা কোনদিকে?' পোয়া জিজ্ঞাসা করল টানিকে। টানি উত্তর দিল—'জানি না—পেঙ তুমি জান?'

পোয়া এই কথার মধ্যে তাদের ঘনিষ্ঠতার সুর লক্ষ্য করল।

'না আমিও জানি না।' জবাব দিল পেঙ।

রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল—'আপনি কি সেফাঙসানে যাবেন?'

'না, এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

রাত্রে পোয়া ও লাওপেঙ একই ঘরে শুল। পোয়া টানির প্রসঙ্গে কথা তুলল—

'আমি আমার খুড়ীমার কাছে শুনলাম টানি অন্তঃস্বত্বা, এখন দেখছি সত্যিই তাই।'

'হ্যাঁ সে তোমার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল; তুমি যে কেন চিঠি-পত্র লিখতে না বুঝতে পারি নি।'

'জানই তো ডাকের কি রকম গোলমাল!'

'এতটা একনিষ্ঠতা আমি খুব কমই দেখছি।'

'তুমি খুব উপকার করেছ।'

'তা যাক্ ! টানির কাছে শুনলাম—তোমার কাকীমা বিয়ের উদ্যোগ করছেন। যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ততই ভাল, তা না হলে পাত্রী সম্বন্ধে নানা কথা রটবে।'

'হ্যাঁ তাড়াতাড়িই করব।'

সে রাত্রে টানির কথাবার্তা এখানেই শেষ হল।

পরদিন সকালে তিনজনে চা খেতে খেতে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ পোয়া টানিকে ঠাট্টা করে বলল—'আচ্ছা দাঁড়াও পাত্রী হিসাবে তোমায় একটু পরীক্ষা করি। দেখি, তুমি পাশ কর কি না।' আসলে কতকগুলি সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন—এর আগে পোয়া কাইনান, লোলা ইত্যাদিকেও করেছিল—কিন্তু তারা কেউ বলতে পারে নি। তাই পোয়া দেখতে চাইল টানিও পারে কি না। কিন্তু টানি এটাকে সহজ ভাবে নিল না—একটু রুষ্টই হল। পোয়ার প্রশ্ন করা হয়ে গেলে টানি বলল—'এবারে আমি তোমায় পরীক্ষা করতে পারি—পাত্র হিসাবে !'

কথাটা পোয়ার কানে একটু কড়া লাগল।

পোয়া ভাবল টানি বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কাজেই পোয়া উৎসাহ ভরে বলল—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করতে পার।'

টানি বলল—'আচ্ছা তুমি তো আমায় ভূগোল সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে—আমি অতি সহজ প্রশ্ন করছি, বল—পেঙকাকার বয়স কত ?'

পোয়া একটু ধাঁধায় পড়ে গেল, একটু ইতস্তত করে বলল—'সাতচল্লিশ কি আটচল্লিশ হবে।'

'না তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ।'

পোয়া লজ্জিত হয়ে পড়ল। নিজেকেই তার উপহাস করবার ইচ্ছে হল। অধিকাংশ সময়েই আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুর বয়সটা পর্যন্ত খেয়াল করি না।

কথাবার্তায় পোয়ার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। লাওপেঙের বয়স পঁয়তাল্লিশ। টানি হঠাৎ পেঙের বয়সের কথা কেন তুলল, কি উদ্দেশ্যে? টানির ভাবখানাও যেন কি রকম! আমার উপর টেক্কা দেওয়ার জন্য, যেন জেহাদ ঘোষণা? হয়ত বা সে বলতে চায় ঐ বয়সের একজন লোককে অনায়াসে ভালবাসতে পারা যায়।

*　　*　　*　　*

সেদিন বিকেলে তারা তিনজন বেড়াতে বেরুল। রেঁস্তোরায় খেতে বসে পোয়া টানির হাতখানা হাতের মধ্যে নিল। টানি কোনরকম আপত্তি জানাল না। কথাপ্রসঙ্গে পোয়া বলল—'দাঁড়াও তোমায় একটা জিনিষ দেখাই।' এই বলে পকেট থেকে সে একখানা খাম বের করল। টানি দেখেই চিনতে পারল যে এ তারই লেখা চিঠি। টানি বলল—'ও তো আমারই লেখা চিঠি।'

'হ্যাঁ তোমারই লেখা—আমার সঙ্গেই থাকে।' এই বলে তার মধ্য থেকে একটা লাল রেশমের টুকরো বের করল।—'মনে আছে?'

টানি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

'আমি একজন আইনজ্ঞকে দেখিয়েছিলাম এটা।'

টানির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'কবে দেখালে?'

'যখন সাংহাইএ ছিলাম।—যাক্, এখন একটা গান কর।'

'আমি ভেবেছিলাম সাংহাই গিয়ে তুমি আমার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে।'

টানির ভীষণ লজ্জা হতে লাগল। পোয়ার ওপর রাগ করে সে তার নিজের টুকরোটা পুড়িয়ে ফেলেছে।

'থাক সে কথা—এখন একটা গান কর। লাওপেঙ, তুমি কোনদিন টানির গান শুনেছ?'

'না।'

টানি গাইতে আপত্তি করছিল কিন্তু পোয়া ছাড়লো না।

'দেখ কতদিন পরে আবার আমরা মিলিত হয়েছি। আজ একটা গান করবে না।' কথাটা বলতে পোয়ার গলাটা একটু কেঁপে গেল।

টানি একটা গান করল।

পরদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনজনে বেড়াতে বেরিয়ে সহরের আশেপাশে অনেক জায়গায় ঘুরল। সঙ্গে খাবার নিয়ে গিয়েছিল—এক জায়গায় বসে খেয়ে নিল। সহরের উত্তর দিকে সৈন্যদের চলাফেরা বেশী। অনেকেই ফিরে আসছে। পোষাক পরিচ্ছদ ছিঁড়ে গিয়েছে। মুখে চোখে শ্রান্তির ছাপ। একজন সামরিক অফিসারকে পোয়া জানাল যে তারা পূর্বদিকে যেতে চায়। অফিসারটি বলল—'আপনাদের বেশীদূরে না যাওয়াই ভাল, পাহাড়ের দিকে যুদ্ধ হচ্ছে।'

দূরে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

পোয়া জিজ্ঞাসা করল—'এখান থেকে কতদূরে যুদ্ধ হচ্ছে?'

'প্রায় দশ মাইল হবে।'

'আমরা অতদূর যাব না।'

'আপনারা বরং গ্র্যাণ্ডক্যানালের ধারে ধারে যান—ও রাস্তাটা কতকটা নিরাপদ।'

তারা পিসিয়েনের দিকে এগুতে লাগল। রাস্তাটা বেশ চওড়া। বিকেল হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরেই হাঁটছিল তারা। যেতে যেতে দেখল, কয়েকটা ছোট ছোট সৈন্যদল পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। মোটরসাইকেলেও কিছু সৈন্য গেল। উপরে একটা জাপানী প্লেন উড়ছিল। পোয়া ক্রমেই বেশ চঞ্চল হয়ে উঠছিল। ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা পোয়ার ছিল না, এই প্রথম।

ঘণ্টাখানেক তারা হাটল। রাস্তার সে জায়গাটা দেখলেই বুঝা যায় যে কয়েক সপ্তাহ আগে এখানে যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। একটা গাছ পড়ে আছে, কামানের গুলিতে গাছটার একদিক পুড়ে গিয়েছে, আর একদিক দিয়ে নতুন পাতা গজিয়েছে। লাওপেঙ সেটাকে দেখিয়ে বলল—'এই হচ্ছে আমাদের চীনের বর্ত্তমান ছবি।'

প্রায় পাঁচমাইল রাস্তা তারা হেঁটেছে। টানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। পাশেই একটা গ্রামে তারা রাত্রি কাটান স্থির করল।

কিছুদিন আগে এ-গ্রাম ছেড়ে সকলেই চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসে বসতি আরম্ভ করেছে। পোয়ারা সকলে একজনের বাড়ীতে বসে এক মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকের কাছে তার এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা শুনছিল। এমন সময় সাইকেলে কিছু সৈন্য এসে ঢুকল সেই পাড়ায়। তারা চীৎকার করে গ্রামের লোকদের তক্ষুনি গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলল। তারা বলল—জাপানীরা এদিকে এগিয়ে আসছে। এখান থেকে তারা তাদেরকে বাধা দেবে। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যে যা পারল তাড়াতাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পোয়া, লাওপেঙ এবং টানিও রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। খানকয়েক শত্রু প্লেন তখন উপরে উড়ছে। আশেপাশে শস্যক্ষেত্রে সৈন্যরা এসে জমেছে, সেখান থেকে তারা জাপানীদের বাধা দেবে। পোয়া একজন অফিসারের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'আমরা কোনদিকে যাব?'

লাওপেঙ পোয়াকে বলল—'একটা সাইকেল চাও টানির জন্য।'

'তুমি কি করবে?'

'আমি হাটতে পারব।'

অফিসারটি তখন ব্যস্ত। তবুও লাওপেঙ তার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল যে টানি গর্ভবতী, তার পক্ষে বেশীদূর হাঁটা সম্ভব নয়। অফিসারটি টানির দিকে চেয়ে একটু বিরক্তভাবে ভ্রূ কুঁচকাল।

'আচ্ছা একটা সাইকেল নিন। এদিকে এসেছিলেন কেন? জানেন এদিকে যুদ্ধ হচ্ছে!'

লাওপেঙ সাইকেলটা এনে পোয়াকে দিল। টানি সাইকেলে যেতে রাজি নয়। লাওপেঙ বলল—'কোন তর্ক নয়, চড়ে নাও। তোমরা যাও আমি পরে যাব।'

টানি কেঁদে ফেলল। বলল—'যদি লাওপেঙ না যায় তা হলে আমাদের যেয়ে কাজ নেই। কাছে বরঞ্চ কোথায়ও লুকিয়ে থাকি আমরা।'

লাওপেঙ একটু রাগতস্বরেই বলল—'আঃ! এখন তর্ক করবার সময় নয়।'

পোয়া ও লাওপেঙ একরকম জোর করেই তাকে সাইকেলে তুলে বসাল। কিন্তু টানি নেমে পড়ল। লাওপেঙ রাগ করে বলল—'যদি আমার ওপর এতটুকু আকর্ষণ থাকে বা কোনরকম অনুভূতি থাকে তাহলে আমার কথা শোন। পোয়ার সঙ্গে যাও, আমি যথাসময় তোমাদের সঙ্গে মিলব।'

কাঁদতে কাঁদতে টানি সাইকেলে উঠে বসল। লাওপেঙকে বলল 'সাবধান হয়ো, নিজের উপর একটু নজর রেখো।'

'খালের ধারে ধারে এসো' বলে পোয়াও সাইকেলে চাপল।

'সাবধানে যেয়ো। আমি যথাসময়ে তোমাদের কাছে গিয়ে পৌছাব। যদি সাকৃকোতে না পারি তবে বিয়েতে নিশ্চয়ই গিয়ে পৌছাব।'

টানি সাইকেলের পিছনে বসে পোয়ার কোমর ধরে চলছিল। বার বার পেছনে ফিরে চায় আর কাঁদে। তার হাত কাঁপছিল। পেছনে মেসিনগানের আওয়াজ ভেসে আসছিল। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, চীৎকার, বন্দুকের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

রাস্তার একটা মোড় ঘুরবার সময় টানি প্রায় পড় পড় হল। পোয়া কোনরকমে টাল সামলে নিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে টানিকে বলল—'কোন ভয় নেই, সে ঠিক আসবে। তুমি একটু ভালভাবে ধর।'

টানি বুঝল তার অন্যায় হচ্ছে।

টানি আবার চাপা কান্না সুরু করল।

আজ এই মুহূর্তে পোয়া বুঝল টানি সত্যই লাওপেঙকে ভালবাসে।

গ্রামছেড়ে তারা প্রায় দু'মাইল এসেছে। সম্মুখে রাস্তার একজায়গায় একটা গর্ত হয়ে গিয়েছে কামানের গোলায়। পোয়া সাইকেল থেকে নেমে টানিকেও নামাল। সাইকেল রেখে পাশের ক্ষেতের মধ্যে ঢুকল তারা। টানি গমের ক্ষেতের মধ্যে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পোয়া তাকে সান্ত্বনা দেয় কিন্তু কিছুতেই তার কান্না থামে না।

'যদি সে মারা যায়?'

'তোমার ভাবনার কোন কারণ নেই, সে ঠিক সুস্থ শরীরেই ফিরে আসবে।'

হঠাৎ তারা দূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল। গমের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে উঁকি মেরে পোয়া দেখল যে বারজন জাপানী অশ্বারোহী সৈন্য খালের ধার ধরে এগিয়ে আসছে। পিস্তলটা নিয়ে পোয়া উঠে দাঁড়াল। জাপানী সৈন্যরা তখন একশ দেড়শ গজ দূরে। নীচু হয়ে টানিকে একবার চুমুখেয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে পোয়া রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

'পোয়া কি করছ, কোথায় যাচ্ছ?' টানি তাড়াতাড়ি উঠে বাধা দিতে গেল। 'ফিরে এস।'

পোয়া ইঙ্গিতে তাকে চুপ করে শুয়ে পড়তে বলল।

রাস্তার উপরে গিয়ে পোয়া দাঁড়াল। তারা তখন এসে গিয়েছে, মাত্র পঁচিশ গজ দূরে। পোয়া গুলি ছুড়ল। প্রথমের একজন পড়ল, তার ঘোড়াটা পিছু হটে গেল। পোয়া আবার গুলি করল—আর একজন পড়ল। আবার গুলি ছুড়ল, আর একজন পড়ল।…টাল খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে পোয়াও মাটিতে পড়ে গেল।

টানি হতবাক্ হয়ে দেখছিল। বাকী কজন ঘোড়াছুটিয়ে পোয়ার উপর দিয়েই চলে গেল। টানি গমের ক্ষেত থেকে বেরিয়ে এল।

মাটিতে মুখ গুজে পোয়া পড়ে আছে, পিস্তলটা তখনও তার হাতে। টানি অনেক চেষ্টা করে তাকে চিৎ করে শোয়াল। ঘোড়ার খুরে পোয়ার একটা পা ভেঙ্গে গিয়েছে। সেখানে হাত দিতেই যন্ত্রণায় সে চীৎকার করে উঠল। জামাটা রক্তে ভিজে গিয়েছে।

'ও পোয়া…।' টানি চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

পোয়া আস্তে চোখ মেলল—দূরে আকাশের দিকে তার দৃষ্টি। টানি তার মুখের উপরে ঝুকে পড়ল। বহু কষ্টে অতি ধীরে পোয়া বলল—'টানি কেঁদো না…লাওপেঙকে বিয়ে কর…।' আবার দম নিয়ে বলল—'আমার সমস্ত টাকাপয়সা…তোমার ছেলেকে মানুষ কর'… পকেটের দিকে দেখিয়ে বলল…'আমার প্রেমের নিদর্শন…প্রতিশ্রুতি…।'

পোয়ার চোখ বুঁজে এল, মাথাটা টলে টানির কোলের উপর পড়ল। কতক্ষণ যে টানি বসেছিল তার ঠিক নেই। হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে তার সম্বিৎ ফিরে এল। দেখল, লাওপেঙ পোয়ার পাশে বসল। নীরবে টানি পেঙের মুখের দিকে চাইল।

'না—শেষ হয়ে গিয়েছে।'

জাপানী সৈন্য তিনটির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে লাওপেঙ জিজ্ঞাসা করল—'এরা?'

'পোয়া মেরেছে।…কি যে দেখলাম তা বলতে পারব না।'

লাওপেঙের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

*　　　*　　　*

সেদিনকার মত সেখানকার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। জাপানী অশ্বারোহীদলের অধিকাংশ মারা গেল এবং বাকী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। চীনের মুক্তি ফৌজ তখন সেখানে এসে জমা হয়েছে। পোয়া কি ভাবে তিনজন জাপানী সৈন্য মেরেছে শুনে সৈন্যরা পোয়ার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে রাজি হল। তারা একটা নৌকা ডাকল। নৌকায় একটি বিধবা মেয়েলোক তার দুই ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল। মাঝিকে সৈন্যরা বলে দিল, সে যেন লাওপেঙের কাছে ভাড়া না নেয়—লোকটি তিনজন জাপানী সৈন্যকে মেরে মরেছে। মাঝি এই ভাবে একটি অনাবৃত মৃতদেহ নিয়ে যেতে অস্বস্তি বোধ করছিল। ছোট মেয়েটির তো ভয়ই করছিল। টানি লাওপেঙকে পোয়ার মুখটা ঢেকে দিতে বলল। লাওপেঙ সৈন্যদের ধন্যবাদ দিয়ে সাইকেলটা তাদের ফিরিয়ে দিল। টানি কাঁদতে কাঁদতে চলল।

অনেকক্ষণ পরে সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে টানির আলাপ হল। তার বয়স হয়েছে, হাঁটবার ক্ষমতা নেই। ছেলেরা তাকে কাঁধে করে নিয়ে এসেছে। ঐ ছোট মেয়েটিকে দেখে পিনপিনের কথা মনে পড়ল টানির। সে বৃদ্ধাকে বলল—'আপনার এই মেয়েটিকে আমায় দেবেন ?'

'কেন দেব না! আমি নিজেই ছেলেদের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। টিয়েনটিয়া তুমি ওঁর সঙ্গে যাও, ওর কাছে থাকবে। আমি আর ক'দিন বাঁচব। তোমার দাদাদের অবস্থা তো দেখছই।'

টানি টিয়েনটিয়াকে কোলের মধ্যে টেনে নিল।

রাত তখন অনেক। নৌকা তীরের কোল ঘেঁসে স্রোতের টানে চলছে। সবাই ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ ঝপ্ করে কি একটা জলে পড়ার শব্দ হল। লাওপেঙ সচকিত হয়ে দেখল—টানি ও মেয়েটি ঘুমাচ্ছে।

কিন্তু মেয়েটির মা ? তার বিছানাটা খালি। ফাক জ্যোৎস্না রাত্রি, জলের শেওলা ও দামগুলি তখনও নড়ছে। লাওপেঙ বুঝল ব্যাপার কি। সে ছেলে দুটিকে ডাকল। তখন আর কোন উপায় নেই। তারা কাঁদতে লাগল। সবারই ঘুম ভেঙ্গে গেল, একমাত্র টিয়েনটিয়া জাগল না।

পরদিন সকালে টিয়েনটিয়া কাঁদতে লাগল—তাকে সান্ত্বনা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। ছেলে দুটিও আর যেতে রাজি হল না। সেখানে নেমে তারা লোকজন নিয়ে মায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করে সৎকার করবে। তারা টিয়েনটিয়াকে বহু কষ্টে টানির সঙ্গে যেতে রাজি করাল। মেয়েটি তখন লাওপেঙকে বলল—'আপনি দাদাদের কিছু টাকা দেন, তাদের কাছে টাকা পয়সা বিশেষ কিছুই নেই।'

লাওপেঙ তাদের দু'শ ডলার দিল। এ টাকাটা পোয়ার নোট বইএ ছিল। মাঝিরা লাওপেঙের কাছে এত টাকা আছে দেখে একটু অবাক্ হয়ে গেল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা এসে চাওটানে পৌঁছাল। যদিও সৈন্যরা ভাড়া না দিতে বলে দিয়েছিল—তবু লাওপেঙ মাঝিকে ত্রিশ ডলার দিল। লাওপেঙের কাছে অনেক টাকা দেখে মাঝির বউ খুঁৎ খুঁৎ করছিল, কিন্তু মাঝির ধমক খেয়ে চুপ করে গেল সে। সেখানে একটা কফিন কিনে পোয়ার মৃতদেহ তার মধ্যে ভরে নেওয়া হল। কিন্তু সাকৃফোতে কফিন নিয়ে যেতে হলে ট্রেণে যেতে হবে। ষ্টেশন মাষ্টার নানারকম ওজর আপত্তি তুলল। অবশেষে সাকৃফোতে টেলিফোন করে অনুমতি পাওয়া গেল।

সাকফোতে পৌঁছে তারা মুলানকে টেলিগ্রাম করল। টানি পোয়ার সুটকেস খুলে অনেক জিনিষপত্রের মধ্যে কতকগুলি চিঠি ও তার ডায়েরীটা পেল। টানির চিঠিপত্র পোয়া কি যত্ন করেই না রেখেছিল। ডায়েরীটা পড়ে টানি স্থির থাকতে পারল না।...কতখানি অন্তর

কোলে পেলে তুমি সহ্য করতে পারবে—তার জন্য ভাবতে হবে কাজের মধ্যে ডুবে যাও শান্তি পাবে।'

'আমি এখনও তোমার সঙ্গে কাজ করতে পারব?'

'কেন পারবে না! বৃহত্তর কাজে আমাদের নামতে হবে।'

টানি স্থির করল পোয়ার সঙ্গেই তার বিয়ে হোক্ এবং পরে বিধবার মতই কাটাবে।

* * *

লাওপেঙের অনুরোধে মিষ্টার টাঙ্ টানির সঙ্গে পোয়ার কুশপুত্তলিকার আনুষ্ঠানিক বিবাহে পৌরহিত্য করলেন। বিবাহ সম্বন্ধ সই করবার সময় মিষ্টার টাঙ্ হেসে টানিকে বললেন—'অনেক রহস্যভেদ করেছি, অনেক সমস্যার সমাধান করেছি, একমাত্র তোমার কাছে হার মানলাম। আমার ধারণা ছিল তুমি পিপিঙে আছ। যাক্ তোমায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * *

জুন মাসে টানি হাঙসানে ফিরে গেল। আবার আশ্রয়প্রার্থীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করল সে। পয়লা সেপ্টেম্বর টানির একটি ছেলে হল।

ইতিমধ্যে টীয়েনটিয়া টানির মনে পিনপিনের শূন্যস্থান পূরণ করেছে। তার ভায়েরা ফিরে এসেছে। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে একটা শান্ত ভাব ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে।

শিবিরের অদূরে পোয়ার কবর। তার ওপরে লেখা আছে—'এর চেয়ে বড় প্রেমিক দেখা যায় না—বন্ধুদের জন্য এ নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে।'

টানির ইচ্ছেতে এবং লাওপেঙের অনুমোদনেই ঐ কথাটা লেখা হয়েছে।